কোরআন থেকে জবাব

খোশরোজ কিতাব মহল

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম

কোরআন থেকে জবাব

মূল ঃ
হারুন ইয়াহিয়া

অনুবাদ
আবুল বাশার

খোশরোজ কিতাব মহল
১৫ বাংলাবাজার, ঢাকা—১১০০

প্রকাশক

মহীউদ্দীন আহমদ

খোশরোজ কিতাব মহল

১৫ বাংলাবাজার, ঢাকা - ১১০০

ফোন ঃ ৭১১৭৭১০, ৭১১৭০৮৪

প্রথম সংস্করণ ঃ জানুয়ারি, ২০০৪

পুনর্মুদ্রণ ঃ অক্টোবর, ২০১০

মূল্য ঃ ষাট টাকা মাত্র

US $: 1 only

ISBN : 984 - 438 - 010 - 3

মুদ্রাকর

মহীউদ্দীন আহমদ

জাতীয় মুদ্রণ

১০৯ হৃষিকেশ দাস রোড, ঢাকা - ১১০০

ফোন ঃ ৭১২০০৫৩

Bengali Translation of **"Answers From the Qur'an"** By Harun Yahya. Copyright Harun Yahya. Bengali Edition Published by Mohiuddin Ahmad of **Khoshroz Kitab Mahal**, 15 Banglabazar, Dhaka - 11000, Bangladesh. Phone : 7117084, 7117710

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ মানবজাতির কল্যাণে, মানবজাতির কাছে বহু গোপন রহস্য উন্মোচন করেছেন। যারা এসব রহস্য অনুধাবনে অক্ষম তাদের সারাটা জীবনই কাটে বিপদে ও সঙ্কটে। পক্ষান্তরে যারা এগুলো সম্পর্কে সম্যক অবহিত হন তাঁরা স্বচ্ছন্দ, রোমাঞ্চপূর্ণ ও আনন্দমুখর জীবনযাপন করেন।

— প্রকাশক

সূচি

আল্লাহ্ প্রেমের স্বরূপ কী ? ... ৩

আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা কি যথেষ্ট নয় ?

আল্লাহর ভয়ও কি অবশ্য প্রয়োজন ? ... ৪

আল্লাহ্‌তে সন্তুষ্ট থাকার অর্থ কী ? ... ৫

আল্লাহর নৈকট্য লাভের অর্থ কী ? ... ৬

অধিক ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিদের স্বতন্ত্রভাবে চিনে নেয়া কি সম্ভব ?

কী ধরনের আচরণ ধার্মিকতার পরিচয় বহন করে ? ... ৭

সুতরাং সর্বাধিক ধর্মানুরাগী কে ? ... ৮

"আশা ও ভয় সহকারে প্রার্থনা" বলতে কী বোঝায় ? ... ৯

কুরআনে বর্ণিত নবীদের ও মুমিনদের প্রার্থনার ধরন কেমন ছিল ? ... ১০

মৃত্যুমুখে পতন লগ্নে কৃত তওবা কি আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য ? ... ১১

মানুষ সচরাচর বিপদে পড়লেই প্রার্থনা করে। এ রকম মূঢ় আচরণ সম্পর্কে কুরআনে কী বলা হয়েছে ? ... ১২

ধর্মানুসারী জীবনযাপন না করলে কেউ সুখী হতে পারে না কেন ? ... ১৩

ইহ জীবনের প্রকৃত স্বরূপ কী ? ... ১৪

"পার্থিব জীবন নিয়েই পরিতুষ্ট ও তৃপ্ত থাকা"—এর মানে কী ? ... ১৫

পাপাচারের তাৎক্ষণিক শাস্তিবিধান না হওয়ার মর্ম কী ? ... ১৬

পার্থিব জীবনে মানুষের দুর্বলতা বা অপরাগতাসমূহের ঐশী কারণগুলো কী ? ... ১৭

নৈতিকতার উৎকর্ষের কি কোন সীমা আছে ? নৈতিকতার একটি বিশেষ স্তরে পৌছে কেউ কি বলতে পারে "ওই যথেষ্ট ?" ... ১৮

কুরআনের নৈতিক বিধিমালা পালনে কীভাবে পারিবারিক কল্যাণ সাধিত হয় ? ... ১৯

কুরআনের নির্দেশ অনুসারে মাতাপিতার প্রতি আচরণ কেমন হওয়া উচিত ? ... ২০

কুরআনে বলছেন আল্লাহ্ দাম্ভিকদের পছন্দ করেন না। তো কুরআনের দৃষ্টিতে দাম্ভিক কাকে বলে ? ... ২১

মুমিনদের ব্যবহারে বিনয়ের তাৎপর্য কী ? ... ২২

উদ্ধত স্বভাবের ব্যক্তির সঙ্গে কেমন ব্যবহার করা উচিত ? ... ২৩

যারা অন্যদের সতর্ক করে, কিন্তু অন্যদের দেয়া নীতিবাক্য নিজেরা অনুসরণ করে না তাদের সম্পর্কে কুরআন কী বলেন ? ... ২৪

মুমিনরাও কি ক্রোধোন্মত্ত হন ? ... ২৫

কুরআনে মুমিনদের যে ন্যায় বিচারের আদর্শ গ্রহণ করতে বলা হয়েছে তার প্রকৃতি কী ? ... ২৬

কুরআনে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার ধারণাটি কীভাবে প্রকাশিত হয়েছে ? ... ২৭

নৈতিক পরিচ্ছন্নতা বলতে কি বোঝায় ? ... ২৮

এতিমদের পরিচর্যার বিষয়ে কুরআনে কী বলা হয়েছে ? ... ২৯

কোন রোগ অক্ষমতা, দারিদ্র্য বা দৈহিক প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কে ফরিয়াদ করা কি উচিত ? ... ৩১

কোন মানুষ কি তার সারা জীবন আল্লাহর জন্যে যাপন করতে পারে ? ... ৩৩

মানুষ নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ ভাবা উচিত নয় কেন ? ... ৩৪

মুমিনদের জীবনে অধৈর্য ও নৈরাশ্য বা হতাশা নামধেয় নেতিবাচক অবগুণগুলোর কোন স্থান আছে কি ? ... ৩৫

কুরআনের দৃষ্টিতে অপব্যয় ও অমিতব্যয়ের স্বরূপ কী ? ... ৩৬

ঈর্ষা বা পরশ্রীকাতরতা সম্পর্কে কুরআন কী বলেন ? ... ৩৮

কাউকে অপবাদমূলক উপনামে ডাকা কুরআন কী চোখে দেখেন ? ... ৩৯

"বিদ্রূপ" সম্পর্কে কুরআনের নির্দেশ কী ? ... ৪০

কুরআনে পরনিন্দার স্থান কোথায় ? ... ৪২

কুরআনে "সন্দেহ"-এর সংজ্ঞা কী ? ... ৪৩

একজন মুসলিমের কীভাবে তাঁর সময় অতিবাহিত করা উচিত ? ... ৪৪

বাজে ও বাতুল বিষয় বর্জন করা যায় কিভাবে ?

"বাজে ও বাতুল" বিষয় কী ? ... ৪৫

ঈমানদারগণ কিসে ধৈর্য প্রদর্শন করেন ? ... ৪৬

নিশ্চয়ই এতে রয়েছে নিশ্চিত উপদেশ বাণী
সেই লোকদের জন্য যাঁরা আমার ইবাদত করে।

—সূরা আম্বিয়া ঃ আয়াত ১০৬

আল্লাহ্ প্রেমের স্বরূপ কী ?

আল্লাহ্ প্রেমের স্বরূপ কী ?

আল্লাহর প্রতি প্রেম হচ্ছে অন্তরের দৃঢ়প্রোথিত মমতা যা' বহু বিচিত্র আবেগের সমাহার। বহু-বর্ণিল এ প্রেমের উপাদানসমূহের মধ্যে রয়েছে অসীম শক্তির অধিকারী স্রষ্টার কাছে সৃষ্টির প্রণিপাত, তাঁর অসীম করুণায় দৃঢ় প্রতীতি, তাঁর অসীম জ্ঞানে গভীর শ্রদ্ধা ও তাঁর অপার সৌন্দর্যে অভিভূত প্রশংসা। আল্লাহ্ সর্বেসর্বা-এই জ্ঞান থেকে আনুগত্য ও উৎসর্জন যুক্ত হয় এই প্রেমে। এই সকল বিষয়ে যিনি অবহিত তিনি গভীর প্রেমে আত্মোৎসর্গ করেন তাঁর প্রভুর কাছে। মধুর এই প্রেম বিশুদ্ধ যেন নিকষিত প্রেম।

যারা অন্য দেবতাদের আল্লাহর অংশীদার সাব্যস্ত করে তাদের বিকৃত প্রেমের ধারণা ও তার বিপরীতে মুমিনদের বিশুদ্ধ, অকৃত্রিম প্রেম সম্পর্কে আল্লাহ্ কুরআনে বলেছেন ঃ

> কিছু লোক আল্লাহ্ ছাড়া অন্যদের তাঁর সমকক্ষ গণ্য করে এবং আল্লাহকে যেমন ভালোবাসা উচিত তেমন ভালোবাসে তাদের কিন্তু যারা প্রকৃত মুমিন আল্লাহর প্রতি তাদের ভালোবাসা মহত্তর। জালিমরা যখন শাস্তির সম্মুখীন হবে তাদের তখনকার অবস্থা যদি তোমরা বুঝতে পারতে! নিশ্চয়ই সকল শক্তি শুধু আল্লাহর এবং আল্লাহ শাস্তিদানে অত্যন্ত কঠোর।
>
> — কুরআন, ২ ঃ ১৬৫

একমাত্র আল্লাহ্ই সত্যিকার অর্থে ভালোবাসার যোগ্য, কেননা, আমরা যা কিছুতে সুখী হই কিংবা যা কিছু আমাদের আনন্দ দান করে তা সবই আল্লাহর

নিয়ামত। তিনিই সত্যিকার সৌন্দর্যের প্রভু। সুতরাং মানুষের উচিত তার সকল প্রিয় বস্তুর প্রতি ভালোবাসা আল্লাহর প্রতি সমর্পণ করা।

আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা কি যথেষ্ট নয় ? আল্লাহর ভয়ও কি অবশ্য প্রয়োজন ?

কুরআন অনুসারে প্রকৃত ভালোবাসার শর্ত হচ্ছে আল্লাহর প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা এবং আল্লাহর অপছন্দনীয় সবকিছু বর্জন। যারা ভালোবাসাই যথেষ্ট মনে করে তাদের জীবন ও কর্মধারা পর্যবেক্ষণ করলে আমরা দেখতে পাই তারা এ শর্ত পূরণে একনিষ্ঠ নয়। কিন্তু আল্লাহর প্রতি যার অকৃত্রিম ভালোবাসা তিনি অবশ্যই দৃঢ়তার সঙ্গে তাঁর আহকাম পালন করেন, তাঁর অপছন্দনীয় সবকিছু বর্জন করেন এবং তাঁর আদিষ্ট কর্মে উদ্যোগী হন। জীবনের প্রতি মুহূর্তে তাঁর সকল উদ্যম ও প্রয়াসে আল্লাহর অনুমোদন যাচ্ঞা করে এবং তাঁর প্রতি গভীরতম শ্রদ্ধা, অন্তরতম বিশ্বাস, আনুগত্য ও বশ্যতা প্রদর্শন করে তিনি আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করেন।

এ রকম প্রগাঢ় ভালোবাসা ও একনিষ্ঠতার ফলেই তাঁর মনে আল্লাহর অনুমোদন না পাওয়া ও তজ্জনিত আল্লাহর ক্রোধ উদ্রেকের একটা ভীতি জন্ম নেয়। অন্যথায়, শুধু মুখে ভালোবাসার কথা বলে কার্যত বেপরোয়া জীবনযাপন ও আল্লাহর নির্দেশিত সীমা লংঘন করা হলে তা নিশ্চয়ই অমার্জনীয় খল আচরণের পরিচায়ক হবে। কুরআনে আল্লাহ মানুষকে আদেশ করেছেন তাঁকে ভয় করতে ঃ

> নিজেকে দ্বীনে কায়েম রাখো বিশুদ্ধ চিত্তে আল্লাহর অভিমুখী হয়ে, এবং তাঁকে ভয় করো ঃ সালাত কায়েম করো, মুশরিকদের শামিল হয়ো না।
>
> — কুরআন, ৩০ ঃ ৩১

আল্লাহ্‌তে সন্তুষ্ট থাকার অর্থ কী ?

আল্লাহ্‌তে সন্তুষ্ট থাকার অর্থ হচ্ছে হৃষ্টচিত্তে আল্লাহর অভিপ্রায়ে পূর্বনির্দিষ্ট ভাগ্য বরণ করা ও তিনি যা দিয়েছেন তাই নিয়ে কৃতজ্ঞচিত্তে সন্তুষ্ট থাকা, নিঃশর্তে ও মনে কোনরূপ দ্বিধাবোধ না করে। কোন ঘটনার অন্তর্নিহিত কল্যাণ হয়তো ঘটমান কালে মানুষ উপলব্ধি নাও করতে পারে ; কিন্তু মানুষ উপলব্ধি করতে পারুক বা না পারুক, প্রত্যেক ঘটনার অন্তর্নিহিত কল্যাণই হচ্ছে আল্লাহর অভিপ্রায়।

বস্তুতঃ তাঁদের ওপর আপাতত যেকোন ঘটনায়ই মুমিনগণ আল্লাহ্‌তে অসীম বিশ্বাসে অবিচলিত থাকেন।

কোন ঘটনার পরিণাম শুভ হবে কি অশুভ হবে তা নিয়ে তাঁরা মাথা ঘামান না। আল্লাহর অভিপ্রায়ে পরিণাম শুভই হবে, তাঁরা জানেন।

কোন মুমিন ব্যক্তি মরণ ব্যাধিতে আক্রান্ত হলে, মারাত্মক দুর্ঘটনায় তাঁর অঙ্গহানি ঘটলে, সকল সম্পদ হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে গেলে, অপরের অনাচারে নির্যাতিত হলে কিংবা সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত প্রতিকূল প্রতিবেশে নিপতিত হলেও এ জ্ঞানে অনাবিল সন্তোষ ও শান্তিতে থাকেন যে জগতে যা কিছু ঘটে সব আল্লাহর গোচরে ও নিয়ন্ত্রণেই ঘটে।

তিনি পরিপূর্ণরূপে আল্লাহ্‌র অসীম জ্ঞান ও অপার করুণার কাছে নিজেকে সমর্পণ করেন। পরিস্থিতি যা-ই হোক না কেন তিনি আল্লাহ্‌র কাছে মশকুর থাকেন। আল্লাহতে সন্তুষ্ট ব্যক্তির আচরণ এমনই হবে। আল্লাহতে সন্তুষ্ট ব্যক্তিদের সম্পর্কে কুরআন বলেন ঃ

.... আল্লাহ্ তাদের অন্তরে ঈমানকে সুদৃঢ়ভাবে প্রোথিত করে দিয়েছেন এবং তাদেরকে শক্তিশালী করেছেন তাঁর তরফ থেকে অদৃশ্য রূহ দান করে। তিনি তাদেরকে বেহেশতে দাখিল করবেন যার তলদেশ দিয়ে স্রোতস্বিনীর অমিয় ধারা প্রবাহিত হবে। সেথায় তাদের অনন্ত অধিবাস। আল্লাহ্ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও সন্তুষ্ট আল্লাহর প্রতি। তারাই আল্লাহর দল। অবশ্যই আল্লাহর দলই কামিয়াব হবে।

— কুরআন, ৫৮ ঃ ২২

আল্লাহর নৈকট্য লাভের অর্থ কী ?

আল্লাহর নৈকট্য লাভের অর্থ হচ্ছে আল্লাহর প্রেম, ভক্তি ও ভীতির মিথস্ক্রিয়ার ফলে উদ্ভূত তুরীয় আবিষ্ট দশাপ্রাপ্তি। মানুষ আল্লাহর কতটা নৈকট্য লাভ করতে পারে তার কোন সীমারেখা নেই। এ দুনিয়ায় সে আল্লাহর যতখানি নৈকট্য লাভ করতে পারবে সে-অনুপাতে সে প্রতিদান পাবে আখিরাতে এবং তদনুযায়ী জান্নাতের অনন্ত জীবনে হবে তার অধিষ্ঠান। কাজেই এ জীবনে তার অভীষ্ট লক্ষ্য হওয়া উচিত আল্লাহর নৈকট্য লাভের সর্বাত্মক প্রয়াস। এতদুদ্দেশ্যে মু'মিনদের প্রয়াসের কথা বর্ণনা করা হয়েছে কুরআনে ঃ

মরুবাসী আরবদের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহর ওপর ঈমান রাখে এবং শেষ দিনের ওপর বিশ্বাস রাখে। তারা যা দান করে তা আল্লাহর নৈকট্য লাভের ও রাসূলের দোয়া লাভের উপায় মনে করে। তারা অবশ্যই আল্লাহর নৈকট্য

> লাভ করে। অচিরেই আল্লাহ তাদেরকে তাঁর রহমতের মধ্যে দাখিল করে দেবেন। পরম ক্ষমাশীল, পরম করুণাময় আল্লাহ।
>
> — কুরআন, ৯ ঃ ৯৯

আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত ব্যক্তির আল্লাহর প্রতি ভালবাসা ও আত্মোৎসর্গ দৃঢ়তর হয়। আল্লাহর অসন্তোষের কারণ হতে পারে এমন কাজ থেকে তিনি দূরে থাকেন এবং এভাবে অন্যকেও দূরে রাখেন। তাঁর ধর্মানুরাগ ও ধর্ম সেবার মনোবৃত্তি প্রবলতর হয় এবং তিনি যত বেশি আল্লাহর নৈকট্য লাভ করেন ততো বেশি তাঁর এসব গুণাবলী উৎকর্ষ লাভ করে।

অধিক ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিদের স্বতন্ত্রভাবে চিনে নেয়া কি সম্ভব ? কী ধরনের আচরণ ধার্মিকতার পরিচয় বহন করে ?

প্রথমেই পরিষ্কার করে নেয়া দরকার যে, প্রাসঙ্গিক তুলাদণ্ডটি হচ্ছে দ্বীন, অন্য কথায় তাকওয়া এবং আল্লাহর ধর্মে অনুরাগ।

এর বাইরে জাতি, বংশপরম্পরা, সামাজিক মর্যাদা ও বিষয় সম্পত্তির কোন গুরুত্বই নেই আল্লাহ ও মুসলমানের দৃষ্টিতে। একটি আয়াতে আল্লাহ এ সত্যটি প্রকাশ করেছেন এভাবে ঃ

> হে মানবজাতি ! আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি একজন পুরুষ ও একজন স্ত্রীলোক থেকে, এবং তোমাদের পরিণত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা পরস্পরকে চিনতে পারো। আল্লাহর দৃষ্টিতে তোমাদের মধ্যে সে-ই সর্বাপেক্ষা সম্ভ্রান্ত যে তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক মোত্তাকী। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সর্ব-সচেতন।
>
> — কুরআন, ৪৯ ঃ ১৩

সুতরাং সর্বাধিক ধর্মানুরাগী কে ?

আল্লাহর দৃষ্টিতে সর্বাধিক ধর্মানুরাগী কে সেটা নিরূপণ করা সত্যিই অসম্ভব। কোন ব্যক্তির ধর্মানুরাগ, সে-অনুরাগের অকৃত্রিমতা ও বিশ্বাস লুকিয়ে থাকে তার অন্তরের অন্তঃপুরে, সেখানের খবর একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কারও পক্ষে জানা সম্ভব নয়।

অন্যরা তার বাহ্যিক আচরণ থেকে একটা অনুমান করতে পারে মাত্র। আল্লাহর প্রতি তার আনুগত্য, আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য তার আন্তরিক প্রয়াস, ধর্মসেবায় তার আগ্রহ ও দৃঢ়তা, মুমিনদের প্রতি তার ভালোবাসা ও তার আনুগত্য তার ধর্মপরায়ণতা সম্পর্কে অভিমতের একটি বাতাবরণ সৃষ্টি করে। তথাপি, চূড়ান্ত বিচারের অধিকার শুধু আল্লাহর।

মানুষ পাপাচার, নিষিদ্ধ কর্ম ও কুরআনের নৈতিকতার পরিপন্থী আচরণ পরিহার করে ধর্মপরায়ণতা অর্জন করে। সুষ্ঠু নৈতিক মূল্যবোধগুলো অনুসরণে জীবনযাপনে অধিকতর দৃঢ়সঙ্কল্প ব্যক্তি ধর্মের সেবায় অধিকতর তৎপর হয় এবং ধর্মের অনুশাসন পালনে অধিকতর যত্নবান হয়। অন্যদের তুলনায় তার ধার্মিকতা উৎকর্ষ লাভ করে।

একজন ধর্মপরায়ণ ব্যক্তির জ্ঞানের দ্বারাও তার ধার্মিকতার স্বরূপ উন্মোচিত হয়। তিনি যে সব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন সেগুলো সঠিক হয়। যে সব সমস্যার তিনি সম্মুখীন হন সেগুলো তিনি দ্রুত সমাধান করতে পারেন। তার বক্তব্য অধিক জ্ঞানগর্ভ ও প্রভাবশালী হয়। কোন ঘটনার যেসব দিক অন্যদের নজর এড়িয়ে যায় তিনি সেগুলো অনুধাবন করতে পারেন, এবং তা পারেন তীক্ষ্ণতর অন্তর্দৃষ্টির সঙ্গে। তাঁর বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত কর্মকাণ্ড দ্বারা তিনি নিজেকে তুলে ধরতে চান না, তিনি বিনম্র ভঙ্গীতে নিজের কর্তব্য করে যান। অন্যের

সন্তোষ ও প্রশংসা তাঁর কাম্য নয়, তাঁর কাম্য শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধান। তিনি যে অবস্থায়ই থাকুন না কেন, আল্লাহর নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে অবস্থান করেন। এসব গুণের অধিকারী ব্যক্তি অবশ্যই সত্য ও ন্যায়পরায়ণ বিবেচিত হবেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও সে ব্যক্তি সত্যিই একজন দ্বীনদার ব্যক্তি কিনা কিংবা কে কার চেয়ে বড় ঈমানদার বা ছোট, সে-বিষয়ে কোন নিশ্চিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় না।

কারণ মানুষ শুধু বাইরে থেকে যা দেখে তার ভিত্তিতে একটা ভাসা-ভাসা মূল্যায়নই করতে পারে। যা নিতান্তই পল্লবগ্রাহিতার শামিল। সত্যিকার ঈমান অনুরাগ, ঐকান্তিকতা ও আল্লাহর নৈকট্য শুধু আল্লাহই জানেন।

"আশা ও ভয় সহকারে প্রার্থনা" বলতে কী বোঝায় ?

আল্লাহ মানুষকে আদেশ করেছেন কে কত ভালো কাজ করতে পারে তা নিয়ে পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতে এবং ভালো কাজের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধানের জন্য সারাজীবন অক্লান্ত প্রয়াসে নিয়োজিত হতে। অবশ্য নিজের কর্মফলের প্রতিদানে বেহেশতে দাখিল হতে পারবেন এরকম স্থির বিশ্বাসে উপনীত হওয়া কারও পক্ষেই সম্ভব নয়। এজন্যেই কোন মুমিন আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা ও উৎসর্জনে যত দৃঢ় ও আন্তরিকই হোন না কেন, তিনি সারাজীবনই প্রতিটি মুহূর্ত যুগপৎ আশা ও ভয় সহকারে অতিবাহিত করেন। জাহান্নামের শাস্তির ভয়ে ভীত হয়ে তিনি আল্লাহর কাছে তার সম্ভাব্য ভুলভ্রান্তির জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। আল্লাহর প্রতি তাঁর প্রেম ও ভক্তি অকৃত্রিম বলেই তিনি আল্লাহর কাছে তাঁর সকল গুনাহ মাফির জন্যে আর্জি করেন। তিনি সর্বদা জাহান্নামের ভয়ে ভীত কিন্তু জান্নাতের আশায় আশান্বিত। কেবল বিচারের দিনেই জানা যাবে কোনটি হবে তাঁর প্রাপ্তি। কুরআনে বর্ণিত আছে ভীতির আর্তি ও আশার দীপ্তি নিয়ে আল্লাহর কাছে নবীদের প্রার্থনা ঃ

তখন আমি তার প্রার্থনা মঞ্জুর করলাম এবং তার স্ত্রীকে সন্তান ধারণক্ষম করে তাকে দান করলাম পুত্র সন্তান য়াহ্য়া। তারা সৎকর্মে পরস্পর প্রতিযোগিতা করত। তারা আমাকে ডাকত আশা ও ভয়ের সাথে। তারা ছিল আমার সমীপে বিনয়াবনত।

— কুরআন, ২১ ঃ ৯০

কুরআনে বর্ণিত নবীদের ও মুমিনদের প্রার্থনার ধরন কেমন ছিল ?

আল্লাহ মুমিনদের প্রার্থনার উপর কোন সীমা নির্ধারণ করে দেননি। তিনি মুমিনদের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন তাঁর স্মরণ নিতে এবং যেকোন প্রয়োজনে তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করতে। তিনি বলেছেন ঃ

আমাকে ডাক, আমি তোমাদের প্রার্থনা মঞ্জুর করব।

— কুরআন, ৪০ ঃ ৬০

কুরআনে নবীদের প্রার্থনা অবলোকন করে আমরা দেখতে পাই তাঁরা পূর্ণ আত্মনিবেদন করে অন্য সকল চিন্তা থেকে মুক্ত হয়ে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতেন। এছাড়াও তাঁরা প্রার্থনা কালে আল্লাহর বিভিন্ন গুণবাচক নাম উল্লেখ করে আল্লাহর প্রশংসা করতেন। মুমিনদের কর্তব্য হচ্ছে সততা ও একনিষ্ঠতা নিয়ে আল্লাহর দিকে ফেরা এবং তাঁর কাছে নিজের সব গোপন কথা প্রকাশ করা।

আল্লাহর কাছে নবীদের ও মুমিনদের প্রার্থনার ঈপ্সিত বিষয়ের যে-সব দৃষ্টান্ত কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে তার কয়েকটি নিম্নরূপ :

> তাঁদের প্রার্থনা-তাঁদেরকে সরল-সঠিক পথে পরিচালিত করতে, যে পথ আল্লাহর নিয়ামত-প্রাপ্ত পুণ্যাত্মাদের এবং সে পথ থেকে দূরে রাখতে যে-পথ ভ্রষ্ট ও বিপথগামী ব্যক্তিদের, তাঁদের আবাসস্থল নিরাপদ রাখতে, তাঁদের নগরের অধিবাসীদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাস করে তাদের ফলের ফসল দিতে, তাদেরকে ও তাদের উত্তরাধিকারীদের আল্লাহতে সমর্পিত মুসলিম কওমে পরিণত করতে, তাদেরকে ইবাদাতের তরিকা সম্পর্কে জ্ঞান দান করতে, তাদের প্রতি করুণার দৃষ্টিতে তাকাতে, তাদের ওপর ইহকালে ও পরকালে নিয়ামত বর্ষণ করতে, তাদেরকে নরকাগ্নির দহনজ্বালা থেকে অব্যাহতি দিতে, উত্থান দিবসে তাদেরকে হতমান না করতে, বিস্মরণ ও ভ্রান্তির কারণে তাদের শাস্তি না দিতে।

নবীদের উচ্চারিত এই সকল প্রার্থনাও আমাদের জন্যে দিক নির্দেশনার কাজ করে। আমাদেরও উচিত দৈনন্দিন জীবনে কায়মনোবাক্যে আল্লাহর নিকট মুহুর্মুহু প্রার্থনায় প্রণত হওয়া এবং তাঁর নিকট আমাদের সকল আশা-আকাঙ্খা ও সঙ্কট সমস্যা অকপটে তুলে ধরা। আমাদের ভোলা উচিত নয় যে, যারা শুদ্ধচিত্তে পূর্ণ আন্তরিকতার সঙ্গে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে তিনি তাদের প্রার্থনা মঞ্জুর করেন।

মৃত্যুমুখে পতন লগ্নে কৃত তওবা কি আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য ?

আল্লাহ কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে ব্যক্ত করেছেন যে, তিনি মানুষের তওবা কবুল করেন, তবে মৃত্যুকালে কৃত তওবা নয়। তবুও মানুষ জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত কৃত অন্যায় কাজের জন্য তওবা করার সুযোগ পাবে। আল্লাহ

কোন্ কোন্ অন্যায়ের জন্যে তওবা করা যাবে সে-রকম কোন সীমা নির্ধারণ করে দেননি। কোন ব্যক্তি নিকৃষ্টতম অপরাধ করা সত্ত্বেও কিংবা বেদ্বীন হওয়া সত্ত্বেও যদি সে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয়, আল্লাহতে ঈমান আনে ও তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে বা তওবা করে তাহলে আল্লাহ ইচ্ছে করলে তার তওবা মঞ্জুর করতে পারেন। কিন্তু কেউ যদি তার কুফরীর দীর্ঘ জীবনে কখনো অনুশোচনা করে আত্মশুদ্ধি করার প্রয়োজনবোধ না করে অথচ শেষ মুহূর্তে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের সময় মৃত্যুর করাল কবলে পড়েছে অনুভব করে আসন্ন মৃত্যুর ভয়ে তওবা করে তার বিষয়টি স্বতন্ত্র। এ ধরনের তওবাকারীদের বিষয়ে কুরআন বলছেন ঃ

> **তওবা তাদের জন্যে নয় যারা অন্যায় কাজ করতে থাকে মৃত্যুর লগ্ন উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত, এবং তখন (মৃত্যুলগ্নে) বলে, "আমি এখন তওবা করছি" ; তওবা তাদের জন্যে নয় যারা মৃত্যুবরণ করে কাফের অবস্থায়। এরকম লোকদের জন্যেই আমি তৈরি করে রেখেছি যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।**
>
> — কুরআন, ৪ ঃ ১৮

মানুষ সচরাচর বিপদে পড়লেই প্রার্থনা করে। এ রকম মূঢ় আচরণ সম্পর্কে কুরআনে কী বলা হয়েছে ?

কুরআনের নৈতিকতা থেকে দূরে অবস্থানকারী ব্যক্তিরাই রোগে-শোকে-কষ্টে কিংবা "বিপর্যয়ে" পড়লেই কেবল আল্লাহকে স্মরণ করে। এ রকম বিপদাপন্ন ব্যক্তিরা আল্লাহর স্মরণ নিয়ে বিপত্তারণ প্রভুর কাছে দিবারাত্র প্রার্থনা করতে থাকে, কিন্তু যে মুহূর্তে বিপদ কেটে যায় সে মুহূর্তে তাদের বোল পালটে যায়।

অতঃপর তারা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতে ও তাঁর কাছ থেকে প্রাপ্ত নেয়ামতের জন্য শোকর গোজার করতে ভুলে যায়। মূলতঃ তারা সাচ্চা ঈমানদার নয় বলেই এটা ঘটে। বিপদকালে তাদের যে-মানসিকতা গড়ে ওঠে তার ভিত্তি হচ্ছে তাদের অসহায়বোধ। বিপদ কেটে গেলেই আল্লাহর প্রতি তাদের কপট আনুগত্যের মুখোশ খসে পড়ে, তাদের নৈকিতাবোধহীন আচরণ প্রকট হয়ে ওঠে।

এ ধরনের ব্যক্তিদের শঠতাপূর্ণ ও আন্তরিকতাহীন আচরণ সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

> **যখন তরঙ্গরাজি চাঁদোয়ার ন্যায় তাদের ঘিরে ফেলে তখন তারা খাঁটি মনে আল্লাহকে ডাকতে থাকে। কিন্তু যখন তিনি তাদেরকে উদ্ধার করে স্থলভাগের ওপর তুলে দেন তখন তাদের মধ্যে কেউ কেউ আবার ভ্রষ্টাচারী হয়ে যায়। কেবল প্রতারক ও অকৃতজ্ঞ ব্যক্তিরাই আমার নিদর্শনাবলি অস্বীকার করে।**
>
> — কুরআন, ৩১ ঃ ৩২

ধর্মানুসারী জীবনযাপন না করলে কেউ সুখী হতে পারে না কেন ?

কোন ব্যক্তি সত্যিকার অর্থে সুখী হতে পারে না যে পর্যন্ত না সে দ্বীন অনুসরণে জীবন-যাপন করে। কেননা, কোন ব্যক্তি সুখী হতে হলে সর্বপ্রথম তার বিবেকের শান্তি-স্বাচ্ছন্দ্য চাই। অর্থাৎ তার মনোজগতে এমন কোন ভাব-ভাবনা বা তার অভাব থাকবে না যা তার চিত্তকে বিক্ষিপ্ত করে, মনকে বিভ্রান্ত করে কিংবা অন্তরে অনুতাপের দহন জ্বালা সৃষ্টি করে। বিবেকের শান্তি লাভের একমাত্র উপায় ধর্মানুসারী জীবনাচরণ।

বিবেক হচ্ছে আল্লাহর নিয়ন্ত্রণাধীনা সে সর্বদা মানুষকে প্রণোদিত করে আল্লাহতে ঈমান আনতে, ধর্মের অনুশাসন প্রতিপালন করতে এবং কুরআনের নৈতিকতার আদর্শে জীবনধারা পরিচালিত করতে। সে কারণেই একজন অধার্মিক ব্যক্তি, যে সারাজীবন বিবেকের নির্দেশের বিরোধিতা করে এসেছে, তার পক্ষে সুখী হওয়া সম্ভব নয়। আল্লাহ কুরআনের মাধ্যমে মানবজাতিকে জানিয়েছেন যে, হৃদয়ের স্বাচ্ছন্দ্য ও প্রকৃত শান্তি লাভ করা যায় কেবল আল্লাহতে ঈমান আনার মাধ্যমে ঃ

> **তারা সেই লোক যারা ঈমান আনে এবং যাদের অন্তর আল্লাহর স্মরণে শান্তি লাভ করে।**
>
> —কুরআন, ১৩ ঃ ২৮

ইহ জীবনের প্রকৃত স্বরূপ কী ?

একটি গুরুতর কিন্তু প্রধানত অস্বীকৃত ভুল ধারণা হচ্ছে এই যে, এ দুনিয়ার জীবনই হচ্ছে প্রকৃত জীবন। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে এই দুনিয়া হচ্ছে মানুষকে পরীক্ষা করার জন্য আল্লাহর সৃষ্ট একটি অস্থায়ী, ক্ষণস্থায়ী আবাসমাত্র। প্রকৃত যা তা হচ্ছে মৃত্যু-উত্তর জীবন, পারত্রিক অনন্ত জীবন। এ দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী অস্তিত্বকালে যা কিছু মানুষকে মোহিত করে, যা কিছু সে উপভোগ করে তা "মায়ার খেলা" মাত্র। সূরা আলে ইমরানের ১৪ সংখ্যক আয়াতে আল্লাহ মানুষকে এ মায়ার প্রপঞ্চ থেকে সাবধান করে তাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, তার প্রকৃত ও মনোরম আবাসস্থল হচ্ছে আল্লাহর সান্নিধ্যে ঃ

> **মানবজাতির কাছে মনোরম করা হয়েছে উপভোগ্য বস্তুসমূহের আকর্ষণ— নারী, সন্তান-সন্ততি স্তূপীকৃত স্বর্ণ-রৌপ্য, সুচিহ্নিত অশ্ব, গবাদি পশু ও ক্ষেত-খামার। এসবই**

কেবল পার্থিব জীবনের ভোগ্যবস্তু মাত্র। এর চাইতে অনেক ভালো আবাস স্থল রয়েছে আল্লাহর সন্নিধানে।

—কুরআন, ৩ ঃ ১৪

এ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মূল্যবান হীরে, জহরৎ, সম্পদ, লাভজনক ব্যবসায়, সুন্দরী জায়া ও ধনাঢ্য পতি, স্বাস্থ্যোজ্জ্বল সন্তান-সন্ততি এসবই হচ্ছে মানুষের জন্য পার্থিব জীবনে মায়ার বন্ধন।

ভোলা উচিত নয় যে, এ-সবই হচ্ছে আল্লাহর দান, মানুষের প্রতি তাঁর নেয়ামত স্বরূপ এবং এগুলো ক্ষণস্থায়ী। কুরআনের বহু আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সত্যিকারের মনোরম আবাসস্থল হচ্ছে পরকালের ঘর।

মানুষের উচিত ইহকালে প্রাপ্ত আল্লাহর নেয়ামত পরকালের প্রস্তুতিতে ব্যবহার করা। এবিষয়ে যারা সচেতন তারা কখনো পার্থিব জীবনে ওইসব মায়ার মোহে আবিষ্ট হয়ে পথভ্রান্ত হয় না।

"পার্থিব জীবন নিয়েই পরিতুষ্ট ও তৃপ্ত থাকা"-এর মানে কী ?

"পার্থিব জীবন নিয়েই পরিতুষ্ট থাকা"-এর অর্থ হচ্ছে যত চিন্তাভাবনা শুধু এই জীবন নিয়েই করা, পরকালের বিষয় উপেক্ষা করা এবং কেবল এই জীবনের জন্যেই বেঁচে থাকা। অর্থাৎ আখিরাতের অনন্ত জীবনের চাইতে মাত্র ৬০/৭০ বছরের নশ্বর এই জীবনকে বরণীয় মনে করা। তা-ই যারা করে তারা ভুলে যায় যে, জান্নাতের জীবনই হচ্ছে পূর্ণাঙ্গ, নিখুঁত ও অনন্ত, এবং পাপ আর ভুলে ভরা এ জগৎ ও জীবন। এ-জীবন কাছে আর সে-জীবন দূরে জ্ঞান করে তারা প্রাণভরে এ জীবনকেই ভোগ করতে চায়। কিন্তু তাদের সবচাইতে বড় ভুল হচ্ছে এ-জগতের জীবন ভোগ কালে সে জগতের জন্যে কোন প্রস্তুতিই গ্রহণ না করা। অথচ যাদের দৃষ্টি পরকালে নিবদ্ধ তারা এ-জীবনও ভোগ

করতে পারবে, আবার জান্নাতের প্রসাদেও ধন্য হবে তারা। পক্ষান্তরে, যারা কেবল এ-জীবন নিয়েই পরিতুষ্ট তারা শুধু এ জীবনের সুখৈশ্বর্যই ভোগ করতে পারবে কিন্তু পরকালে তারা পাবে তাদের প্রাপ্য শাস্তি। যারা এজীবন নিয়েই পরিতুষ্ট, আখিরাতে তাদের প্রতিদান কী হবে তার আভাস দেয়া হয়েছে কুরআনে ঃ

> **যারা আমার সাক্ষাৎ লাভের প্রত্যাশী নয় এবং পার্থিব জীবন নিয়েই পরিতুষ্ট এবং তাতেই পরম প্রশান্তি অনুভব করে এবং যারা আমার নিদর্শনসমূহের বিষয়ে উদাসীন তাদের আশ্রয় হবে নরকের অগ্নিকুণ্ডে, যেটা তাদের অর্জন।**
>
> — কুরআন, ১০ ঃ ৭-৮

যারা স্রষ্টাকে ভুলে গিয়ে এ জীবনের ভোগে-মোহে আত্মবিলীন হয়ে যায় তারা হারায় অপার আশীর্বাদময় এক অনন্ত জীবন। এ জীবনে যে-সব বস্তুর মোহে আচ্ছন্ন ছিল তারা পরকালে সে-সবের চিহ্নমাত্র দেখতে পাবে না।

পাপাচারের তাৎক্ষণিক শাস্তিবিধান না হওয়ার মর্ম কী ?

পাপাচারের তাৎক্ষণিক শাস্তি হয় না বলে কারও শৈথিল্য প্রদর্শনে উৎসাহিত হবার কারণ নেই। কেননা, আল্লাহ মানুষকে সময় দিয়েছেন, একটা নির্দিষ্ট কালপরিধিতে আল্লাহ মানুষকে পরীক্ষা করেন। তিনি নেক আমলের জন্য জান্নাতের অঙ্গীকার করেছেন এবং বদ আমলের জন্য জাহান্নামের যন্ত্রণাময় শাস্তির হুশিয়ারী দিয়েছেন। সুতরাং পাপ করেও সঙ্গে সঙ্গে শাস্তি না পেলে পার পেয়ে গেলাম বলে ভাবার কোন কারণ নেই, বরং পাপ হয়েছে বোঝার সঙ্গে সঙ্গেই তওবা করার জন্যে আল্লাহর প্রেম ও করুণায় যে সময় দেয়া হয়েছে তা স্মরণ করা উচিত।

কুরআনে আল্লাহ এ বিষয়ে মানব জাতিকে সতর্ক করে বলেছেন ঃ

> যদি আল্লাহ মানুষের কৃতকর্মের জন্য আশু ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন তাহলে পৃথিবীতে কোন প্রাণীর অস্তিত্বই থাকত না, কিন্তু তিনি একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তাদের সুযোগ দেন। তারপর যখন তাদের সময় আসবে তখন আল্লাহ তাঁর বান্দাদের দেখে নেবেন।
>
> — কুরআন, ৩৫ ঃ ৪৫

সুতরাং সকল সচেতন ব্যক্তিরই উচিত ভুল বা অপরাধ হয়েছে বুঝতে পারার সঙ্গে সঙ্গেই অনুশোচনা ও সংশোধনের সকল সুযোগ গ্রহণ করা এবং পুনরাবৃত্তির বিরুদ্ধে সতর্ক হওয়া।

পার্থিব জীবনে মানুষের দুর্বলতা বা অপরাগতাসমূহের ঐশী কারণগুলো কী ?

পার্থিব জীবনে মানুষ অনেক ভৌত বিচ্যুতির শিকার। প্রথমতঃ মানুষকে তার শরীর ও পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখতে হয় এবং অহর্নিশ সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হয়। এতেই তার আয়ুষ্কালের একটা বৃহৎ অংশ খরচ হয়ে যায়। কিন্তু সে যত যত্নই নিক এবং পরিচ্ছন্ন থাকুক না কেন, তার সুফল সাময়িক। আপনি অতি যত্ন সহকারে দাঁত পরিষ্কার করে ব্রাশটি তুলে রাখার ঘন্টাখানেক পরে, ব্রাশটি শুকোবার আগেই, আপনার মনে হতে শুরু করবে যেন আপনার দাঁতে হাত পড়েনি কোনদিন। প্রখর সূর্যতাপে তপ্তদেহ শীতল জলে স্নাত করার মাত্র দুঘন্টা পরেই মনে হবে জলস্পর্শ হয়নি কত কাল।

এখানে যে বিষয়টি বুঝতে হবে তা হচ্ছে এই যে, শরীরে এই দুর্বলতাগুলো অকারণ বা উদ্দেশ্যহীন নয়, তাদের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য আছে। শরীরের দুর্বলতাগুলো অন্তর্নিহিত নয় বরং বিশেষভাবে সৃষ্ট। অনুরূপভাবে বার্ধক্য ও তার অনুষঙ্গী দুর্বলতা বা অক্ষমতাগুলো আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন এ উদ্দেশ্যে যেন মানুষ মানবজীবনের ক্ষণস্থায়িত্ব সম্পর্কে ভাবিত হয়, পার্থিব জীবনের মোহে আবিষ্ট না হয় এবং আখিরাতের "প্রকৃত আবাস"-এর দিকে তার লক্ষ্য স্থির রাখে।

আল্লাহ কুরআনের একটি আয়াতে উল্লেখ করেছেন যে মানুষের পরম লক্ষ্য হচ্ছে পরলোক ঃ

> পার্থিব জীবন দু'দিনের খেলামাত্র। আখিরাতের আবাসই হচ্ছে মোত্তাকীদের জন্য শ্রেয়। তবুও কি তোমরা বুঝবে না।
>
> — কুরআন, ৬ ঃ ৩২

নৈতিকতার উৎকর্ষের কি কোন সীমা আছে ? নৈতিকতার একটি বিশেষ স্তরে পৌছে কেউ কি বলতে পারে "ওই যথেষ্ট"?

নৈতিকতার উৎকর্ষের কোন সীমারেখা নেই। প্রতিটি আচরণ ও প্রতিটি উচ্চারিত কথার ক্ষেত্রেই বলা যায় এর চাইতে ভালো আচরণ করা যেত এবং এর চাইতে ভালো কথা বলা যেত। "ওই যথেষ্ট" বা "এর চাইতে ভালো আর হয় না"-এরকম কথা কখনোই বলা যায় না। যে-মুহূর্তে কোন ব্যক্তি ভেবে বসে যে, সে সন্তোষজনক স্তরে পৌছে গেছে সে মুহূর্তেই তার নৈতিক ও ব্যবহারিক জীবনে দুর্নীতির সূচনা হয়। যেহেতু সে মনে করে যে, তার আর

নিজেকে নবায়নের প্রয়োজন নেই সেহেতু সে আর কোন সুষমায় সঞ্জীবিত হতে পারে না এবং তার চরিত্রেরও অধিকতর উৎকর্ষ সাধন হয় না।

যারা নিজেদের স্বয়ংসম্পূর্ণ বলে ভাবে তাদের উদ্ধত বলে ভর্ৎসনা করে আল্লাহ বলেন ঃ

> মানুষ অবশ্যই সংযমহীন, কারণ সে নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ ভাবে। — কুরআন, ৯৬ ঃ ৬-৭

এ কারণেই মানুষের উচিত আমৃত্যু আত্মোন্নয়ন করে যাওয়া এবং আরো আত্মোন্নয়নের প্রয়াস অব্যাহত রাখা। আল্লাহর সিদ্ধান্ত জানার পূর্ব পর্যন্ত কেউ নিশ্চিত হতে পারে না আল্লাহর সন্তুষ্টি ও জান্নাত লাভ সম্পর্কে।

কুরআনের নৈতিক বিধিমালা পালনে কীভাবে পারিবারিক কল্যাণ সাধিত হয় ?

কুরআনের নৈতিকতা মাতাপিতাকে সম্মান করার নির্দেশ দেয়। এ-সম্পর্কে আল্লাহ বলেন ঃ

> আমি মানুষকে নির্দেশ দিয়েছি তার মাতাপিতার সাথে সদাচরণ করতে। কারণ তার মা অনেক কষ্ট স'য়ে তাকে জন্ম দিয়েছে এবং তারপর দু'বছর লেগেছে তাকে দুধ ছাড়াতে। সুতরাং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো আমার প্রতি ও তোমার মাতাপিতার প্রতি। সবাইকেই ফিরে আসতে হবে আমার কাছে।
>
> —কুরআন, ৩১ ঃ ১৪

যে পরিবারে কুরআনের নৈতিকতার আদর্শ প্রতিষ্ঠিত সেখানে কোন ঝগড়া, বিবাদ বা সংঘর্ষ হতে পারে না। পিতামাতার প্রতি পরম শ্রদ্ধাশীল আচরণ প্রদর্শন করা হয় এবং পরিবারের সকল সদস্যের মধ্যে যথাযথ মর্যাদাপূর্ণ ও সৌহার্দ্য সম্পর্ক বিরাজ করে। আনন্দময় পরিবেশে সুখী জীবনযাপন করে সকলে।

দারিদ্র বা প্রাচুর্য কোন অবস্থাতেই পরিবারের সদস্যদের পারস্পরিক শ্রদ্ধা, প্রীতি ও ভালোবাসার সম্পর্ক বিঘ্নিত হয় না। তারা সর্বাবস্থায় পরস্পরকে সাহায্য-সহযোগিতা করে।

কুরআনের নির্দেশ অনুসারে মাতাপিতার প্রতি আচরণ কেমন হওয়া উচিত ?

আল্লাহ মানুষকে আদেশ করেছেন পিতামাতার সঙ্গে সদয় ব্যবহার করতে। তাঁদের সঙ্গে বিনম্র ভাষায় কথা বলা, তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা প্রদর্শন করা এবং তাঁদের সমব্যথী হওয়া কুরআনের নৈতিকতার নির্দেশ। মাতাপিতার প্রতি বিরক্তি প্রকাশ বারণ করেছেন আল্লাহ। সূরা আল-ইসরা'র দুটি আয়াতে কুরআন বলছেন ঃ

> তোমার প্রভু আদেশ করেছেন যে তাঁকে ছাড়া আর কারও ইবাদত করো না এবং পিতামাতার সাথে সদয় ব্যবহার করো। যদি তাঁদের উভয়ে বা কোন একজন তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হন তাহলে তাদের প্রতি কখনো 'উহ্' বলে বিরক্তি প্রকাশ করো না এবং কর্কশ ভাষায় কথা বল না ; বিনম্র ও সহৃদয় ভাষায় কথা বল।

> সদয়ভাবে বিনয়ের সঙ্গে তাদেরকে তোমার পক্ষপুটে গ্রহণ করো এবং বল ঃ হে আমার রব ! তাঁদের প্রতি কৃপা প্রদর্শন কর যেমন তাঁরা আমাকে শৈশবে লালন-পালন করে।
>
> — কুরআন, ১৭ ঃ ২৩-২৪

মাতা-পিতা যদি তাদের বিশ্বাসে বিশ্বাসী না হয় এবং আল্লাহ্‌তে ঈমান না আনে তাহলেও মুমিনগণ তাঁদের পিতামাতার প্রতি সদয় ও সশ্রদ্ধ ব্যবহার করে যান। পিতামাতার পরামর্শ বা উপদেশ ধর্মের পরিপন্থী হলে তাঁরা তা গ্রহণ করেন না কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধাপূর্ণ ব্যবহারে হেরফের হয় না। সর্বাবস্থায়ই পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করতে তাঁরা দায়বদ্ধ। কুরআনের একটি আয়াতে আল্লাহ্‌ আদেশ করছেন ঃ

> আমি মানুষকে মাতাপিতার সাথে সদ্ব্যবহার করতে আদেশ দিয়েছি, তবে তারা যদি তোমাকে চাপ দেয় আমার সঙ্গে এমন কিছু শরীক করতে যার সম্পর্কে তোমাদের কোন জ্ঞান নেই তাহলে তুমি তাদের অনুগত হবে না। আমার কাছেই তোমাকে ফিরে আসতে হবে, তখন আমি তোমাকে দেখাব তোমার কার্যকলাপ।
>
> — কুরআন, ২৯ ঃ ৮

কুরআনে বলছেন আল্লাহ্‌ দাম্ভিকদের পছন্দ করেন না। তো কুরআনের দৃষ্টিতে দাম্ভিক কাকে বলে ?

কুরআনের দৃষ্টিতে দাম্ভিকতার প্রধান চরিত্র লক্ষণ হচ্ছে সকল প্রাপ্তিই যে আল্লাহর দান সে কথা ভুলে গিয়ে সেগুলোর অধিকারী হবার কারণে নিজের

কল্পিত শ্রেষ্ঠত্বের দাবিতে দম্ভ প্রকাশ করা। এ-ক্ষেত্রে একটা গুরুতর ভ্রান্তি হচ্ছে যারা তাদের আচরণে বাড়াবাড়ি করে, ঔদ্ধত্য ও গর্ব প্রকাশ করে, শুধু তাদেরকেই দাম্ভিক বা অহঙ্কারী বিবেচনা করা।

কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে যে কেউ ভুলে যায় যে, তার যা' কিছু প্রাপ্তি সবই আল্লাহর দান এবং এ বিস্মরণে প্রভাবিত হয় তার আচরণ সে-ই অহঙ্কারী বা দাম্ভিক। নিজের সাফল্য নিয়ে বাগাড়ম্বর করা এবং আল্লাহর কাছে নিজের অসহায়ত্বের বিষয় অনুধাবন না করাও অহঙ্কার বলে বিবেচিত।

এজন্যে প্রত্যেকেরই আপ্রাণ চেষ্টা করা উচিত স্বীয় সাফল্য, কৃতিত্ব বা অর্জনের গর্বে স্ফীত না হবার জন্যে। মুহূর্তের জন্যেও তার ভুলে যাওয়া অনুচিত যে আল্লাহর সমীপে সে নিতান্তই অসহায় ও আর্তজন। আল্লাহ চাইলে পলকে তার পূর্ণ কুম্ভ শূন্য করে দিতে পারেন।

মুমিনদের ব্যবহারে বিনয়ের তাৎপর্য কী ?

বিনয়কে কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে মুমিনদের একটি মহৎ গুণরূপে। বিভিন্ন আয়াতে এটাও উল্লেখ করা হয়েছে যে, আল্লাহ দুর্বিনীত ব্যক্তিদের ও যারা বাড়াবাড়ি করে তাদের পছন্দ করেন না।

মুমিন হচ্ছেন তাঁরা যারা জানেন যে, আল্লাহই সৃষ্টিকর্তা ও সর্বেসর্বা এবং কেবল তিনিই মানবজাতির উপরে নিয়ামত বর্ষণ করেন। তাঁরা আল্লাহর সমীপে তাঁদের দুর্বলতা সম্পর্কে সজাগ বিধায় কখনো তাঁদের ব্যবহারে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেন না। যত সুদর্শন, ধনবান, বুদ্ধিমান বা যশস্বীই হোন না কেন সেজন্য তাঁরা অহমিকা প্রকাশ করেন না ; বরং এসবই তাঁদের জন্য আল্লাহর দান বলে মনে করেন। এ কারণে অন্য মুমিনদের প্রতি তাঁদের ব্যবহারও বিনীত হয়। তাঁরা তাঁদের কর্মদক্ষতা বা অন্য গুণাবলীর প্রতি অন্যদের দৃষ্টি

আকর্ষণ করেন না। কেননা, তাঁরা জানেন তাঁদের সকল কৃতির জন্যে পুরস্কার তাঁরা পাবেন একমাত্র আল্লাহর কাছ থেকে।

অবিশ্বাসী দুরাত্মাদের দুর্বিনীত আচরণের বিপরীতে বিনীত মুমিনগণ বিনম্র আচরণ করেন এবং তাঁদের এই বৈশিষ্ট্য তাঁদের চালচিত্রেও প্রতিফলিত হয়। তাঁদের এই বৈশিষ্ট্যের উপরই আলোকপাত করা হয়েছে কুরআনের একটি আয়াতে ঃ

> **পরম করুণাময়ের বান্দা তো তারাই যারা ধরার বুকে বিনম্র লঘুচালে পদচারণা করে এবং মূর্খরা যখন তাদের সম্বোধন করে তখন তারা বলে, "সালাম"।**
>
> — কুরআন, ২৫ ঃ ৬৩

> **তোমাদের উপাস্য একমাত্র আল্লাহ। সুতরাং তাঁর নিকট আত্মসমর্পণ কর এবং বিনম্রচিত্ত যাদের তাদের সুসংবাদ দাও।**
>
> — কুরআন, ২২ ঃ ৩৪

উদ্ধত স্বভাবের ব্যক্তির সঙ্গে কেমন ব্যবহার করা উচিত ?

মুমিনদের অন্যতম বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত স্বকীয়তা হচ্ছে স্থান-কাল-পাত্র নির্বিশেষে দ্বীন ও সুনীতি অনুসরণে জীবনযাপনে তাঁদের দৃঢ় সঙ্কল্প। সে কারণেই কোন মুমিন ব্যক্তি যখন কোন উদ্ধত স্বভাবের ব্যক্তির মুখোমুখী হন তখন তিনি নিজেও সেই ব্যক্তির মত ভুল করেও প্রতি-ঔদ্ধত্যে লিপ্ত হন না ; বরং প্ররোচনার মুখেও বিনীত-বিনম্র আচরণ করেন এবং তার চোখের সামনে একটা দৃষ্টান্ত স্থাপনেরও চেষ্টা করেন। এরূপ আচরণই তাঁর পছন্দনীয় বলে নির্দেশ করেছেন আল্লাহ। বিনয় অবিনয়কে প্রতিহত করে, সংশোধন করে,

সুবিনয়ে রূপান্তরিত করতে পারে— এ সম্ভাবনার প্রতি তর্জনী সংকেত করেছেন আল্লাহ একটি আয়াতে ঃ

> ভাল ও মন্দ সমান নয়। উত্তমকে দিয়ে অধমকে প্রতিহত করুন, ফলে একদিন যে আপনার শত্রু ছিল সে আপনার অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে যাবে।
>
> —কুরআন, ৪১ ঃ ৩৪

যারা অন্যদের সতর্ক করে, কিন্তু অন্যদের দেয়া নীতিবাক্য নিজেরা অনুসরণ করে না তাদের সম্পর্কে কুরআন কী বলেন ?

কুরআনে আল্লাহ মুমিনদের পরামর্শ দিয়েছেন পরস্পরকে ভালো কাজে উৎসাহিত করার ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখার জন্যে। এ পরামর্শ গ্রহণ অবশ্যই আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধান করে। তবে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে যে-কাজে অন্যকে উৎসাহিত করা হচ্ছে নিজেও তা করা এবং নিজেদের আচরণে ও নৈতিকতা অনুসরণে অপরের কাছে দৃষ্টান্ত স্থাপন করা। কারণ অপর ব্যক্তি যদি কোন কাজকে মন্দ কাজ বলে জানে এবং এ আচরণে প্রভাবিত হয় তাহলে সেও সেই মন্দকাজ থেকে বিরত হবে। এ বিষয়ে মুমিনদের প্রতি আল্লাহর নির্দেশ হচ্ছে এই ঃ

> তোমরা কেতাব পাঠ কালে অন্যদের ধর্মনিষ্ঠ হবার উপদেশ দাও কিন্তু নিজেরাই ভুলে যাও কি ? তোমাদের কি বোধোদয় হবে না ?
>
> — কুরআন, ২ ঃ ৪৪

কাজেই সকলেরই উচিত আগে নিজের ঘর সামলানো। তারপর অন্যদের সতর্ক করা। যদি কেউ অন্যদের অহরহ নৈতিকতার নসিহত করে কিন্তু নিজে

এ বিষয়ে শূণ্য থাকে তাহলে অবশ্যই তার আন্তরিকতা প্রশ্নবিদ্ধ হবে। আপনি আচরি ধর্ম পরকে শেখাও।

মুমিনরাও কি ক্রোধোন্মত্ত হন ?

কোন কোন ক্ষেত্রে আর সবার মত মুমিনদেরও ক্রোধের উদ্রেক হতে পারে। তবে তাঁদের পুণ্য জীবনের অন্যতম বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে এই যে, তাঁরা অবলীলায় এই ক্রোধ সংবরণ করতে পারেন। তাঁরা জানেন অসংবৃত ক্রোধ থেকে ভালো কিছুই পাওয়া যাবে না, এই ক্রোধ শুধু তাঁদের বিচার-বুদ্ধিকে রাহুগ্রস্ত করবে এবং তাঁদেরকে ন্যায়পরতা থেকে বিচ্যুত করবে। তাঁরা তাঁদের ও প্রতিবেশীদের জন্য ক্ষতিকর কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ থেকে বিরত থাকেন। এ কারণেই মুমিনগণ একনিষ্ঠতা ও ক্ষমাশীলতা প্রদর্শন করেন।

মুমিনদের এ বৈশিষ্ট্য ও গুণের প্রশংসা করেছেন আল্লাহ কুরআনে এই ভাষায় ঃ

> **যারা স্বচ্ছল-অস্বচ্ছল সর্বাবস্থায়ই দান করে এবং যারা ক্রোধ সংবরণ করে ও অন্যদের ক্ষমা প্রদর্শন করে ; যারা ভাল কাজ করে আল্লাহ্ তাদের ভালবাসেন।**
>
> — কুরআন, ৩ ঃ ১৩৪

তবে "ক্রোধ সংবরণ" কথাটি ভুল অর্থে গ্রহণ করা উচিত হবে না ঃ ক্রোধ সংবরণ মানে সবকিছু যেমন আছে তেমনই থাকবে বলে স্বীকার করা নয়, কিংবা নিষ্ক্রিয় থাকাও নয়। মুমিনগণ সকল ঘটনারই প্রতিক্রিয়ায় সাড়া দেন এবং অন্যায় কাজ প্রতিরোধ করতে কিংবা অন্য মুমিনদের ক্ষতি করতে পারে এমন পরিস্থিতি পরিবর্তন করতে সচেষ্ট হন। কিন্তু তাঁরা আবেগ-তাড়িত

হয়ে কাজ করেন না ; তাঁরা যুক্তিসম্মত সমাধান নির্ণয় করে চেষ্টা করেন অন্যায়কারীকে তার ভ্রান্তি থেকে মুক্ত করতে, তাকে ঠিক পথে ফিরিয়ে আনতে কিংবা উদ্ভূত ক্ষতিকর পরিস্থিতির পরিবর্তন করতে।

কুরআনে মুমিনদের যে ন্যায় বিচারের আদর্শ গ্রহণ করতে বলা হয়েছে তার প্রকৃতি কী ?

আল্লাহ মুমিনদের আদেশ করেছেন সকল ঘটনা কুরআনের আওতার মধ্যে ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে মূল্যায়ন করতে। এ আদেশ পালনই হচ্ছে মুমিনদের একটি প্রধান গুণ। একজন মুমিনের কোন পরিকল্পিত সিদ্ধান্ত বা সাক্ষ্য তাঁর নিজের স্বার্থের পরিপন্থী হতে পারে কিংবা তাঁর কোন আত্মীয় তাতে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেন কিন্তু সেটা তাঁর কাছে বিবেচ্য বিষয় হতে পারে না। কেননা, তিনি আল্লাহকে ভয় করেন এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধানই হচ্ছে সকল বিচার-বিবেচনার মানদণ্ড। আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধানের পরিপন্থী কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণে বা সাক্ষ্যদানে মুমিনগণ অন্তরে শান্তি বা স্বস্তিবোধ করতে পারেন না।

এ কারণেই মুমিনগণ তাঁদের স্বার্থের প্রতিকূলেও ন্যায়বিচারের আদর্শে অবিচল থাকেন। কোন ব্যক্তি যদি কোন কারণে অন্য কোন ব্যক্তির প্রতি ক্রোধান্বিত থাকে তাহলে সেই ক্রোধের কারণে বিচার কাজে সে দ্বিতীয়োক্ত ব্যক্তির প্রতি ন্যায়বিচার না করার আশঙ্কা দেখা দেয়। ক্রোধ বা বিদ্বেষের কারণে দ্বিতীয়োক্ত ব্যক্তি উপকৃত হতে পারে এমন কোন কাজ না করার একটা প্রবণতা তার মধ্যে দেখা দিতে পারে। কিন্তু মুমিনগণ যেহেতু আল্লাহকে ভয় করেন এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধানই তাদের লক্ষ্য, সেহেতু তাঁরা এ রকম কোন প্রবণতাকে প্রশ্রয় দেন না ; বিরাগভাজন ব্যক্তিটি উপকৃত হবে কি হবে না সে কথা বিবেচনা না করেই তাঁরা নিরাসক্তভাবে ন্যায়বিচার করেন। এ প্রশ্নে মুমিনদের প্রতি আল্লাহর আদেশ ঃ

..... কোন কওমের বৈরিতা যেন তোমাদের ন্যায়বিচার থেকে বিরত হতে প্ররোচিত না করে। ন্যায়বিচার করো। সেটাই দ্বীনের নিকটতর।

— কুরআন, ৫ ঃ ৮

কুরআনে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার ধারণাটি কীভাবে প্রকাশিত হয়েছে ?

মুমিনগণ পরিচ্ছন্ন লোক। সূরা মুদাছছির-এর ৪ ও ৫ নং আয়াতে নির্দেশ করা হয়েছে, "পোষাক-পরিচ্ছদ পরিষ্কার রাখুন, ময়লা ও অপরিচ্ছন্নতা পরিহার করুন।" তদনুসারে মুমিনগণ সর্বদা তাঁদের ঘরবাড়ী, শরীর, পোশাক-আশাক পরিষ্কার ও নির্মল রাখেন।

তাঁরা তাদের আবাসস্থল কুরআনে বর্ণিত জান্নাতের মোহনীয় পরিবেশের অনুরূপ মানে গড়ে তুলতে চেষ্টা করেন। তাঁরা যে খাদ্য গ্রহণ করেন তাও পরিচ্ছন্ন, কেননা, তাঁরা কুরআনের সূরা বাকারার ১৭২নং আয়াতে প্রদত্ত নির্দেশটি পালন করেন ঃ "হে মুমিনগণ ! আমি তোমাদের জন্য যে উত্তম খাদ্যবস্তু সমুহের সংস্থান করেছি তা থেকেই আহার কর।"

মুমিনদের পরিচ্ছন্নতাবোধ কেমন হবে সে সম্পর্কে একাধিক আয়াতে আল্লাহ নির্দেশনা দিয়েছেন। এরূপ একটি আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

..... আমার সাথে কোন কিছুকে শরীক কর না এবং আমার গৃহকে পরিষ্কার রেখো তাদের জন্য যারা গৃহটি প্রদক্ষিণ (তাওয়াফ) করে এবং যারা সালাতে কায়েম হয়, রুকু করে ও সিজদা করে।

— সূরা আল-হাজ্জ, ২২ ঃ ২৬

নৈতিক পরিচ্ছন্নতা বলতে কি বোঝায় ?

কুরআনে আল্লাহ নির্দেশ করেছেন যে, শুধু শারীরিকভাবে নয়, নৈতিকভাবেও মানুষকে পরিচ্ছন্ন হতে হবে। যারা নাফ্‌স্‌কে প্রতিরোধ করে আত্মার শুদ্ধি লাভ করে তারাই সফল হবে, এ মর্মে কুরআনের দুটি আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

> কসম মানুষের আত্মার ও যিনি তাকে আকৃতিতে সুঠাম করেছেন তাঁর, অতঃপর তাকে তার মন্দ কর্ম ও তার তাকওয়ার জ্ঞানদান করেন ; যে নিজেকে পরিশুদ্ধ করতে পেরেছে সে-ই সফল হয়েছে, কিন্তু ব্যর্থ হয়েছে সে ব্যক্তি যে পাপাচারে নিজেকে কলুষিত করেছে।
>
> —কুরআন, ৯১ ঃ ৭-১০

নাফ্‌সের মন্দ কাজের প্ররোচনাকে প্রতিহত করে নৈতিক শুদ্ধি লাভ সম্ভব। নৈতিক শুদ্ধি লাভ যে করে, অকৃত্রিম ঈমানের প্রসন্নতা ও আত্মার শান্তি লাভ করে সে। তার সকল চিন্তা ও কর্ম সত্য, সুন্দর ও ন্যায়ানুগ। যেকোন পরিস্থিতির মোকাবেলায় তার আচরণ স্পষ্টভাবে দেখিয়ে দেয় যে, সে আল্লাহতে পূর্ণতঃ পরিতুষ্ট ও নিঃশেষে সমর্পিত। সে আন্তরিক ও অকৃত্রিম। সে জানে আল্লাহর সকল সৃষ্টিতেই মঙ্গল নিহিত।

নৈতিকতার এ স্তরে উন্নীত ব্যক্তিগণ তাদের নাফ্‌সের স্খলন থেকে মুক্তি লাভ করে। তাদের সুমঙ্গল আখিরাতের সুসংবাদ দিয়েছেন আল্লাহ নিম্নোদ্ধৃত আয়াতাংশে ঃ

..... যে কেউ নিজেকে পরিশুদ্ধ করে সে তা করে কেবল নিজেরই জন্যে। আল্লাহর সামীপ্যই তোমার চূড়ান্ত গন্তব্য।

— কুরআন, ৩৫ ঃ ১৮

এতিমদের পরিচর্যার বিষয়ে কুরআনে কী বলা হয়েছে ?

কুরআনের ৯৩ সংখ্যক সূরা (সূরা দোহা)-এর ৯নং আয়াতে আল্লাহ মানুষকে এতিমদের প্রতি সহানুভূতিশীল হতে ও তাদের সঙ্গে সদয় আচরণ করতে নির্দেশ দিয়ে বলেছেন ঃ

"অতএব আপনি এতিমদের সঙ্গে নিষ্ঠুর আচরণ করবেন না।"

— কুরআন, ৯৩ ঃ ৯

অন্যান্য আয়াতে আল্লাহ মানুষকে আদেশ করেছেন এতিমদের অধিকারের প্রতি স্বীকৃতি দিতে, তাদের জন্য সহায়-সম্পদ ও আয়ের একটি অংশ আলাদা করে রেখে দিতে ও তাদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করতে।

আরও আদেশ করেছেন এতিমদের সম্পদ ন্যায়সঙ্গতভাবে ব্যবহার করতে ও মানসিক পরিপক্কতা লাভের পর তাদের সম্পদ তাদের কাছে ফিরিয়ে দিতে।

আল্লাহ কুরআনের বাণীর মাধ্যমে মানুষকে পরামর্শ দিয়েছেন এতিমদের সুশিক্ষা লাভে যত্নবান হতে যাতে করে তারা আল্লাহর উত্তম বান্দারূপে গড়ে ওঠে ও কুরআনের নৈতিকতায় জীবনযাপনে কৃতসংকল্প হয়। তিনি মুমিনদের

উৎসাহিত করছেন এতিমদের সুরক্ষা ও বাস্তব সহায় সংস্থান করে সঠিকভাবে বিকশিত করে তুলতে ঃ

> ..... এতিমদের সম্পত্তি সম্পর্কে তারা আপনাকে জিজ্ঞেস করবে। বলবেন, তাদের সম্পত্তি তাদের স্বার্থে সর্বোত্তম পন্থায় ব্যবহার করাই সর্বোত্তম হবে। যদি তাদের সম্পত্তি তোমাদের সম্পত্তির সঙ্গে মিশিয়ে ফেল তাহলে তো তারা তোমাদের ভাই হয়ে গেল .....
>
> — কুরআন, ২ ঃ ২২০

ঈমানদার ব্যক্তিগণ সর্বদা এতিমদের সম্পত্তি নিয়ে কোন রকম অবিচার করা থেকে বিরত থাকেন, কেননা, এতিমদের সম্পত্তির লোভ করা ও তা থেকে সুবিধা গ্রহণ করা গুরুতর জুলুম ও অপরাধ বলে বর্ণনা করা হয়েছে কুরআনে ঃ

> .... এতিমদের সম্পত্তি তাদের দিয়ে দাও এবং ভাল মালের সঙ্গে খারাপ মাল বদল কর না। তোমাদের মালের সঙ্গে মিশিয়ে ফেলে তাদের মাল গ্রাস কর না। সেটা গুরুতর অপরাধ।
>
> — কুরআন, ৪ ঃ ২

এসব কারণে মুমিনগণ এতিমদের সম্পত্তি সর্বপ্রযত্নে সুরক্ষা করেন তাদের বয়ঃপ্রাপ্তি ও স্বীয় সম্পদ ব্যবস্থাপনায় পারঙ্গমতা অর্জন পর্যন্ত এবং বয়ঃপ্রাপ্তির পর তাদের হাতে তুলে দেন তাদের সকল সম্পদ ও অধিকার।

অপরপক্ষে যারা এতিমদের অধিকার খর্ব করে এবং তাদের দুঃখ-দুর্দশায় নিপতিত করে তারা তাকওয়ায় বিশ্বাসী নয়। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন কুরআনে ঃ

ধর্মে যার বিশ্বাস নেই তাকে কি দেখেছেন আপনি ?
সেতো ওই ব্যক্তি যে নির্দয়ভাবে এতিমকে তাড়িয়ে দেয়
এবং দরিদ্রদের অন্ন-সংস্থানে উৎসাহদান করে না।

— কুরআন, ১০৭ ঃ ১-৩

কোন রোগ, অক্ষমতা, দারিদ্র্য বা দৈহিক প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কে ফরিয়াদ করা কি উচিত ?

রোগ-বালাই, শারীরিক অক্ষমতা বা দারিদ্র্য আল্লাহরই বিশেষ সৃষ্টি এবং এর উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষকে পার্থিব জীবনের অনিত্যতা সম্পর্কে সচেতন ও জান্নাতের অনন্ত জীবনের আকাঙ্খায় উদ্দীপিত করা। এ আকাঙ্খা ও উদ্দীপনাই তাকে সেই লক্ষ্য সাধনে ব্রতী করতে পারে। তাই এইসব দুর্গতি হচ্ছে প্রকৃত প্রস্তাবে দুর্দশার ছদ্মাবরণে বান্দাদের প্রতি আল্লাহর নিয়ামত। যার দূরদৃষ্টি আছে সে জানে এ দুনিয়ায় যে-সব পরিস্থিতি সমস্যা, সঙ্কট কিংবা দুঃখ-যন্ত্রণা বলে প্রতীয়মান হয় আসলে সেগুলো তার আখিরাতের অনন্ত জীবনের জন্য আশীর্বাদমাত্র। আল্লাহ তাঁর সেই বান্দাদের জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যারা এ দুনিয়ার জীবনের দুঃখ-দুর্দশা ও বিপদ-সঙ্কটের মোকাবেলায় আল্লাহতে অটল বিশ্বাস স্থাপন করে ও একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য সদা সচেষ্ট থাকে। অধিকন্তু আল্লাহ জান্নাতে এসব মানুষের ইহজীবনের সকল দৈহিক ও আত্মিক অসম্পূর্ণতা দূর করে তাদেরকে সুন্দরতম ও অনন্তরূপে রূপবান করে সৃষ্টি করবেন।

সুতরাং অনুরূপ কোন অসম্পূর্ণতায় মুখোমুখী হয়ে কারও উচিত নয় এই বিষয়টি বিস্মৃত হওয়া, বরং তার কর্তব্য হবে অসীম জ্ঞানের অধিকারী প্রভুর কাছে সম্পূর্ণরূপে আত্মনিবেদন করা, কেননা, তার ভাগ্যে যে, দুর্ভোগ ঘটেছে

বা ঘটমান তার মধ্যে নিহিত রয়েছে অফুরন্ত কল্যাণ ও অসীম জ্ঞান যা সম্পর্কে সে সম্পূর্ণ অনবহিত। দারিদ্র্য, কদাকৃতি বা রোগ-বালাইয়ের মত মানুষের অপছন্দনীয় পরিস্থিতিতে পড়ে ক্ষুব্ধ হওয়া বা ফরিয়াদ করা কুরআনের নৈতিকতার পরিপন্থী।

অবশ্যই রোগমুক্তির জন্য মানুষ আধুনিকি চিকিৎসা বিজ্ঞানের সকল সুযোগই গ্রহণ করবে এবং জীবন পথের বাঁকে বাঁকে নানা সমস্যার জটিল আবর্ত থেকে উদ্ধার লাভের জন্যও আপ্রাণ চেষ্টা করবে। তবে সকল প্রয়াসের ফল যদি শূন্য হয় তাহলে তার যা কর্তব্য তা হচ্ছে আল্লাহ তার জন্যে যে ভাগ্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন তা অবলীলায় গ্রহণ করা।

মনে রাখতে হবে, কোন দশার জন্যে কোন ব্যক্তির ফরিয়াদ করা এবং সেই দশায় সুখী না হওয়ার অর্থ হচ্ছে আল্লাহ তার জন্যে যে একটা উত্তম দশা ইচ্ছে করেছেন সেই দশায় সে অসন্তুষ্ট। এটা নিঃসন্দেহে আল্লাহর প্রতি অকৃতজ্ঞতা। কেননা, তিনি সকল ঘটনার সৃষ্টি করেন মানুষকে পরীক্ষা করার জন্যে এবং সেই ঘটনাকে রূপান্তরিত করেন মানুষের অনন্ত মোক্ষলাভের উপায়রূপে। এ ক্ষেত্রে মুমিনদের আদর্শ আচরণ সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

> আপনি বলে দিন ঃ আল্লাহ যার বিধান করে দিয়েছেন তার বাইরে কিছুই ঘটবে না আমাদের জীবনে। তিনিই আমাদের কার্যনির্বাহক। কেবল আল্লাহর ওপর ভরসা করাই উচিত মুমিনদের।
>
> — কুরআন, ৯ ঃ ৫১

কোন মানুষ কি তার সারা জীবন আল্লাহর জন্যে যাপন করতে পারে ?

পার্থিব জীবনের প্রকৃত অর্থ সম্পর্কে আল্লাহ্ কুরআনে বলেছেন ঃ

> **জীবন ও মৃত্যু তিনিই সৃষ্টি করেছেন তোমাদের মধ্যে কর্মে শ্রেষ্ঠ কে তা পরীক্ষা করার জন্যে। তিনিই সর্বশক্তিমান, সতত-ক্ষমাশীল।**
>
> — কুরআন, ৬৭ ঃ ২

প্রত্যেকেই পরীক্ষিত হয় তার কর্মে। যারা উত্তম কাজ করে তারা আল্লাহর সন্তুষ্টি ও স্বর্গ লাভ কামনা করে। এটাই তাদের জীবনের আরাধ্য পরমার্থ। কাজেই তারা স্বতঃই অনুধাবন করতে পারে তাদের জীবনের প্রতিটি মুহূর্তেই নিবেদন করতে হবে এ সাধন প্রয়াসে।

কিছু লোকের মনে অবশ্য ভুল ধারণা রয়েছে এ বিষয়ে। তারা মনে করে কেবল সালাত কায়েম করা ও নিষিদ্ধ কর্ম থেকে বিরত থাকাই আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য প্রয়োজন, বাকী সময়টা ধর্মের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়।

কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে মানুষের কর্তব্য হচ্ছে প্রতি মুহূর্তে, প্রতি পদক্ষেপে প্রতিবাক্যে, কর্মে-চিন্তায় আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধানে অক্লান্ত চেষ্টা করা। জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত আল্লাহর ধ্যানে যিনি ব্যয় করতে চান তিনি সর্বদা এমনভাবে ও ভাষায় কথা বলবেন যা আল্লাহর কাছে প্রীতিকর বিবেচিত হবে। তিনি সবাইকে আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দেন, অন্যায় কর্মে প্রবৃত্ত হতে নিষেধ করেন এবং

সৎকর্মে প্রণোদিত করেন। প্রতি মুহূর্তেই তিনি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের সর্বোত্তম পন্থা নিয়ে চিন্তা করেন।

আল্লাহর জন্যে সারা জীবন যাপন করা তথা আল্লাহর কাছে সারা জীবন সমর্পণ করা হচ্ছে দ্বীনের একটি মৌলিক দাবি। আল্লাহ তাই কুরআনের একটি আয়াতে আদেশ করেছেন ঃ

> **বলুন ঃ আমার সালাত, আমার যাবতীয় ধর্মকর্ম, আমার জীবন ও আমার মৃত্যু সব কিছুই একমাত্র আল্লাহর জন্য, যিনি সারা জাহানের প্রতিপালক।**
>
> — কুরআন, ৬ ঃ ১৬২

মানুষ নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ ভাবা উচিত নয় কেন ?

আল্লাহ-ভীরু মানুষের জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে নৈতিকভাবে আল্লাহর প্রিয়ভাজন হওয়া। এরূপ ব্যক্তি জানেন তাঁর নিজেকে ও তাঁর আচরণ আরো উন্নত করার জন্যে সতত সচেষ্ট হতে হবে। কেননা, আন্তরিকতা, সততা, নিষ্ঠা আত্মোৎসর্গ, বিনয় প্রভৃতি গুণের কোন "উর্ধ্বতর সীমা" নেই। অন্য কথায় বলতে গেলে, কেউ বলতে পারে না "আমি আদর্শ আচরণের গুণ অর্জন করেছি, এর চাইতে ভালো আর হতে পারে না।" কোন ব্যক্তির আত্মিক উন্নয়ন দ্রুততর হবে যদি সে নিজেকে অসম্পূর্ণভাবে এবং সম্পূর্ণতা অর্জনে প্রয়াসী হয়। এরূপ প্রয়াসে সে নিজেকে পাপকর্ম থেকে মুক্ত করে প্রতিনিয়ত উন্নততর হবার চেষ্টা করে। কেউ কোন বিষয়ে নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ ভাবলে সেতো আর আরো ভালো হতে চেষ্টা করবে না, কেননা, সে তার ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলো দেখতে পাবে না এবং সেগুলো শোধরাবার চেষ্টাও করবে না। আল্লাহ কুরআনের দুটি আয়াতে বলেছেন যে, মানুষের নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ ভাবা একটি গুরুতর ভ্রান্তি ঃ

মানুষ বড়ই অসংযত, কেননা, সে নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ বলে বিবেচনা করে।

— কুরআন, ৯৬ ঃ ৬-৭

কুরাআনের এ সতর্কবাণীর আলোকে মানুষ নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ ভাবতে পারে না। আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধায়ক সৎকর্মে কিংবা আধ্যাত্মিক সিদ্ধিলাভে মানুষ কখনো স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারে না। আল্লাহ তাকে যে জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দান করেছেন তার সদ্ব্যবহার করে তাকে সতত উন্নত থেকে উন্নততর স্তরে পৌঁছবার পথ সন্ধান করতে হবে।

মুমিনদের জীবনে অধৈর্য ও নৈরাশ্য বা হতাশা নামধেয় নেতিবাচক অবগুণগুলোর কোন স্থান আছে কি ?

কুরআনের একটি আয়াতে আল্লাহ মানুষকে বিপদে অধীর না হতে বলে আদেশ করেছেন ঃ

হে মুমিনগণ! তোমরা একনিষ্ঠ হও, একনিষ্ঠতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন কর, রণক্ষেত্রে বলীয়ান হও, এবং আল্লাহকে ভয় করো, তা হলে আশা করা যায় তোমরা কামিয়াব হবে।

— কুরআন, ৩ ঃ ২০০

মুমিনগণ বিপদ উত্তরণের জন্য তাঁদের মেধা এবং সকল বস্তুগত ও আত্মিক উপায় অবলম্বন করেন এবং বিদ্যমান পরিস্থিতিতে সম্ভাব্য সর্ব প্রযত্নে সঙ্কট নিরসনের চেষ্টা করেন। কিন্তু তথাপি তাঁরা শেষ ভরসা আল্লাহর ওপরেই রাখেন, কেননা, তাঁরা জানেন এ বিপদ সঙ্কট মানুষকে পরীক্ষা করার জন্যে

আল্লাহরই সৃষ্ট বিশেষ দশা এবং এসবের মধ্যেই নিহিত রয়েছে পরম কল্যাণ। আল্লাহর ওপর ভরসা মুমিনদের একনিষ্ঠতার একটি অপরিহার্য উপাদান। তাঁদের অবিচল প্রতীতি রয়েছে যে, আল্লাহ অসীম প্রজ্ঞায় সকল দশার সৃষ্টি করেন এবং মুমিনদের ইবাদতের বিনিময়ে তাঁদের সঙ্কটমুক্ত করেন। সে কারণেই মুমিনগণ কখনো অধীর ও হতাশ হয়ে ভেঙ্গে পড়েন না।

আল্লাহ মুমিনদের কোন অবস্থায়ই তাঁর করুণা সম্পর্কে নৈরাশ্যবোধ না করতে নির্দেশ দিয়েছেন। কুরআনের একটি আয়াতে তিনি বলেছেন ঃ

> আপনি বলুন যে আল্লাহ বলেছেন ঃ হে আমার বান্দাগণ, তোমরা যারা নিজেদের ওপর জুলুম করেছ, তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমা করবেন সকল গুনাহ। তিনি পরম ক্ষমাশীল, অপার করুণানিধি।
>
> — কুরআন, ৩৯ ঃ ৫৩

কুরআনের দৃষ্টিতে অপব্যয় ও অমিতব্যয়ের স্বরূপ কী ?

আল্লাহ তাঁর বান্দাদের অমিতব্যয়ী হতে নিষেধ করেছেন এবং মিতব্যয়ের তুলাদন্ড নির্ধারিত করে দিয়েছেন ঃ

> তারা যখন ব্যয় করে তখন সেই ব্যয়ের মাত্রা অমিতব্যয়ীও হয় না, কৃপণও হয় না, বরং এ-দুয়ের মাঝামাঝি হয়।
>
> — কুরআন, ২৫ ঃ ৬৭

মুসলিমগণ সবকিছু আল্লাহর পথে ব্যয় করেন এবং আল্লাহর সর্বোচ্চ সন্তুষ্টি বিধান হয় এমনভাবে ব্যয় করেন। তাঁরা ভোলেন না যে, তাঁদের যা কিছু আছে আল্লাহই তা নিয়ামত স্বরূপ তাঁদের দিয়েছেন এবং তার প্রকৃত মালিকও তাঁরা নন। তাঁদের যখন আত্মত্যাগ করতে হয় তখন তাঁরা তাঁদের যা কিছু আছে সব ব্যয় করেন কুরআনের নির্দেশ মোতাবেক। কিন্তু অনাব্যশকভাবে তাঁরা এক কপর্দকও ব্যয়-অর্থাৎ অপব্যয় করেন না। আল্লাহ কুরআনে মুমিনদের নির্দেশ দিয়েছেন যারা অভাব-অনটনে আছে তাদেরকে দান করতে, কিন্তু তিনি বারণ করেছেন অপব্যয় করতে ঃ

> আত্মীয়স্বজনকে যা তাদের প্রাপ্য তা বুঝিয়ে দেবে এবং অতি দরিদ্রদের ও মুসাফিরদেরও দান করবে, কিন্তু কোনমতেই তোমার সম্পদ অপব্যয় করবে না। অপব্যয়ীরা শয়তানের ভাই, আর শয়তান ছিল স্বীয় রবের প্রতি অকৃতজ্ঞ।
>
> — কুরআন, ১৭ ঃ ২৬- ২৭

কিন্তু অপব্যয় (বা অপচয়) পরিহার করার ভুল অর্থ করে আল্লাহর দানকেও পরিহার করতে বলা হচ্ছে মনে করা ঠিক হবে না। আল্লাহ কুরআনে বলছেন ঃ

> ..... আহার কর, পান কর, কিন্তু অপচয় কর না, তিনি অপচয়কারীদের পসন্দ করেন না।
>
> — কুরআন, ৭ ঃ ৩১

এ আয়াতে আল্লাহ মুমিনদের বলেছেন তাঁর দান উপভোগ করতে কিন্তু বারণ করেছেন অপচয় করতে। কিন্তু আজকের দিনে যে-সব সমাজের

অবস্থান ধর্ম থেকে দূরে সে-সব সমাজে অপচয়ের প্রশ্নটি ঔদাসীন্যে উপেক্ষিত। বাড়ীতে, হোটেলে, রেস্তোরায় থালাভর্তি খাবার ও ঝুড়িভর্তি রুটি, সবজি ও ফলমূল হেলাভরে ফেলে দেয়া হয়। কিন্তু আল্লাহ অপচয় নিষিদ্ধ করেছেন, তা যে পরিমাণে যত কমই হোক কিংবা বেশি। কাজেই সবারই উচিত আল্লাহর দান নষ্ট হবার পূর্বেই সদ্ব্যবহার করার চেষ্টা করা এবং "বাসী হয়ে গেছে" কিংবা "আমাদের আর কাজে লাগছে না এটা" বলে ফেলে না দিয়ে বরং কাজে লাগাবার উপায় সন্ধান করা। এভাবেই কেবল এসব দানের যথাযথ মূল্য প্রদান করা যায়, অন্যথায় অপব্যয়ের পরিণাম হয় অনটন ও আল্লাহর প্রতি অকৃতজ্ঞতা।

ঈর্ষা বা পরশ্রীকাতরতা সম্পর্কে কুরআন কী বলেন ?

ঈর্ষা বা পরশ্রীকাতরতার নিন্দা করা হয়েছে কুরআনে। আল্লাহ কুরআনে বলেছেন তিনি মানুষের আত্মাকে ঈর্ষাপ্রবণ করে সৃষ্টি করেছেন কিন্তু মুমিনদের এব্যাপারে সতর্ক হতে বলেছেন ঃ

> ..... কিন্তু লোভ-লালসা মানুষের সহজাতপ্রবণতা। তোমরা যদি নেক আমল কর ও মোত্তাকী হও, তোমাদের কর্ম সম্পর্কে আল্লাহ অবহিত।
>
> — কুরআন, ৪ ঃ ১২৮

অপরের শ্রেষ্ঠতা গ্রহণে অপারগতা থেকেই ঈর্ষার উদ্ভব। এ মানসিকতা এমনকি আল্লাহর প্রতি হঠকারিতায় পরিণত হতে পারে। কেননা, মানুষের যা কিছু আছে সবই আল্লাহর দান, তিনি যাকে যা ইচ্ছা দান করেন, কেউ বা কিছুই তার ব্যত্যয় ঘটাতে পারে না। এছাড়া কুরআনে এ-ঘটনারও বর্ণনা করা হয়েছে যে, শয়তান আদম (আঃ)-কে সিজদা না করে আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে,

কারণ সে নিজেকে আদমের থেকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করে। এ ঘটনা থেকেই আমরা একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক নির্দেশনা পেয়ে যাই ঃ ঈর্ষা বস্তুতঃ শয়তানেরই একটি অবগুণ, আল্লাহকে যে ভয় করে সে অবশ্যই কঠোরভাবে তা পরিহার করবে।

কাউকে অপবাদমূলক উপনামে ডাকা কুরআন কী চোখে দেখেন ?

যারা ধর্ম অনুসরণ করে না, তারা অন্যদের অপবাদমূলক উপনামে ডাকে। উদ্দেশ্য, অন্যদের এভাবে হেনস্থা করে তাদের ওপর নিজেদের কল্পিত উচ্চতর মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করা। কিন্তু মুমিনগণ কখনো এমন গর্হিত আচরণ করেন না। আল্লাহ মুমিনদের জন্য কঠোরভাবে এরূপ আচরণ নিষিদ্ধ করেছেন এবং যারা এ নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে তাদের পাপাচারী বলে নির্দেশ করেছেন ঃ

> হে মুমিনগণ! তোমাদের মধ্যে পুরুষেরা অন্য পুরুষদের উপহাস কর না, কেননা, তারা উপহাসকারীদের চাইতে উত্তম হতে পারে, এবং নারীরাও অন্য নারীদের উপহাস কর না, কেননা, তারা তোমাদের চাইতে উত্তম হতে পারে। তোমরা একে অন্যের দোষত্রুটি খুঁজে বেড়িয়ো না এবং পরস্পরকে অবমাননাকর উপনামে ডেকে হেনস্থা কর না। ঈমান আনার পরেও ফাসিক নামাঙ্কিত হওয়া অতীব গর্হিত কাজ। যারা এ-থেকে নিবৃত্ত না হয় তারাই প্রকৃত পাপাচারী।
>
> — কুরআন, ৪৯ ঃ ১১

যাঁরা কুরআনের নৈতিকতা অনুসারে জীবনযাপন করেন তাঁরা কখনো আল্লাহর অননুমোদিত এরূপ গর্হিত আচরণ করেন না। তাঁরা পরস্পরকে সুপ্রিয়

ভাষায় সম্বোধন করেন এবং আল্লাহর অনুগত বান্দারূপে পরস্পরকে গভীর শ্রদ্ধাপ্রদর্শন করেন।

"বিদ্রূপ" সম্পর্কে কুরআনের নির্দেশ কী ?

বিদ্রূপ হচ্ছে নিম্ন রুচি ও অনৈতিকতার বহিঃপ্রকাশ, আল্লাহ যা' অনুমোদন করেন না। বিধর্মী সমাজগুলোতে বহুভাবেই এ আচরণের প্রকাশ ঘটে, যেমন, কারু অক্ষমতা বা বৈকল্যের বিদ্রূপ করা, কাউকে অপ্রীতিকর উপনামে ডাকা, ইত্যাদি। কুরআনে আল্লাহ মানুষকে এই অসদাচরণের বিরুদ্ধে সতর্ক করে বলেছেন ঃ

> ছিদ্রান্বেষী পরনিন্দাকারীরা নিপাত যাক।
>
> — কুরআন, ১০৪ ঃ ১

কুরআনে আল্লাহ আরেক ধরনের বিদ্রূপের উল্লেখ করেছেন যেটা কাফেররা করে থাকে মুমিনদের বিরুদ্ধে। কুরআন বলেছেন যে, মুমিনগণ ঠিক পথে আছেন এটা বুঝতে না পেরে কাফেররা, যারা নিজেদেরকে মুমিনদের চাইতে শ্রেষ্ঠ ভাবতো, মুমিনদের বিদ্রূপ করে। কয়েকটি আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

> পাপিষ্ঠরা মুমিনদের দেখে হাসাহাসি করত ; মুমিনগণ পাশ দিয়ে যাবার সময় তারা পরস্পর কটাক্ষ বিনিময় করত।
>
> — কুরআন, ৮৩ ঃ ২৯ -৩০

কিন্তু এই পাপিষ্ঠরা মহাবিভ্রান্ত, তাদের পরিণাম হবে শোচনীয়। কুরআন বলছেন ঃ

> অথচ আজ মুমিনরাই হাসাহাসি করছে তাদের দেখে ; সুসজ্জিত পালঙ্কে বসে মুমিনরা তাদের দেখবে ; তারা যা করত তার সমুচিত প্রতিফল পেয়েছে তো ?
>
> — কুরআন, ৮৩ ঃ ৩৪ -৩৬

যারা ইসলাম প্রত্যাখ্যান করে ও কুরআনের বাণীকে বিদ্রূপ করে তাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলছেন যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলদের সকল সতর্কবাণী উপেক্ষা করেছে, আল্লাহর ক্ষমতার পূর্ণ পরিমাপ করতে ব্যর্থ হয়েছে এবং এ বিষয়টি অনুধাবনেও ব্যর্থ হয়েছে যে, তারা আল্লাহর উপস্থিতিতেই বিচারের সম্মুখীন হবে। কিন্তু তারা আখিরাতে দিশেহারা হয়ে যাবে এবং তাদের বিদ্রূপ, তাদের উপেক্ষা ও তাদের ব্যর্থতার যথাযোগ্য প্রতিফল তারা পাবে। তারই আভাস দেয়া হয়েছে কুরআনে ঃ

> তারা এমন লোক, যারা অস্বীকার করছে তাদের রবের আয়াতসমূহকে এবং তাঁর সাথে সাক্ষাৎকে। ফলে তাদের যাবতীয় আমল নিষ্ফল হয়েছে। অতএব কিয়ামতের দিন আমি তাদের জন্য কোন ওজনই কায়েম করব না। জাহান্নামই হবে তাদের অবধারিত প্রাপ্তি। কেননা, তারা আমার নিদর্শনসমূহকে উপহাস করেছে এবং আমার রাসূলদেরকে বিদ্রূপ করেছে।
>
> — কুরআন, ১৮ ঃ ১০৫-১০৬

কুরআনে পরনিন্দার স্থান কোথায় ?

কুরআনে আল্লাহ মুমিনদের জন্য পরনিন্দা পরচর্চা নিষিদ্ধ করেছেন। পরনিন্দাকে একটি অশালীনতা বলে বর্ণনা করেছেন আল্লাহ ঃ

> ..... তোমরা অসাক্ষাতে পরস্পরের নিন্দা কর না। তোমাদের মধ্যে কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের মাংস ভক্ষণ করতে পছন্দ করবে ? না, তোমরা অবশ্যই তা ঘৃণা করবে। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। আল্লাহ সতত তওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু।
>
> — কুরআন, ৪৯ ঃ ১২

এ আয়াতের নির্দেশ অনুসারে, যারা দ্বীনের অনুসরণ করেন এবং পরস্পর ভাইবোনের মত সম্পর্কে আবদ্ধ থাকেন, তাঁরা সযত্নে পরনিন্দার মত অসদাচরণ পরিহার করেন। পরন্তু তাঁরা পরস্পরের শুভেচ্ছা স্মরণ করেন এবং সর্বদা একে অন্যের সদগুণগুলো তুলে ধরার চেষ্টা করেন। আল্লাহর ইচ্ছার কাছে সমর্পিত যারা তাদের চরিত্রে কোন দোষত্রুটি খুঁজে বেড়ান না তাঁরা।

আল্লাহর নির্দেশিত সীমা যাঁরা লংঘন করেন না সেই মুমিনদের চরিত্র সর্বদা পরনিন্দার মত কলুষ থেকে মুক্ত। কোন মুমিনের চোখে যখন অন্য কোন মুমিনের কোন দোষ বা ত্রুটি ধরা পড়ে তখন তিনি পরোক্ষে বা অসাক্ষাতে তার নিন্দা করেন না, বরং সাক্ষাৎ-প্রমুখাৎ তাকে তার দোষ দেখিয়ে দিয়ে আত্মশোধনে উদ্বুদ্ধ করেন।

কুরআনে "সন্দেহ"-এর সংজ্ঞা কী ?

সন্দেহ ও অনুমানের ভিত্তিতে কোন কর্মে প্রবৃত্ত হওয়া হচ্ছে আরেকটি অনৈতিকতা যা আল্লাহ অনুমোদন করেন না। কুরআনের অনেক আয়াতে আল্লাহ বলেছেন সন্দেহবশে কাজ করা গোমরাহ সমাজগুলোরই একটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং ওতে মানুষের কোন কল্যাণ সাধিত হয় না। তিনি তাঁর ঈমানদার বান্দাদের সন্দেহ বাতিক পরিহারের নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহর এই আদেশ অনুসরণে মুমিনগণ কখনো কোন অসম্পূর্ণ বা ভিত্তিহীন তথ্যে প্রণোদিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন না। তাঁদের উচ্চারিত প্রতিটি শব্দ বা গৃহীত প্রতিটি সিদ্ধান্ত কুরআনের নৈতিকতার অনুসরণে পূর্ণ ও সংশয়াতীত তথ্য ও সাক্ষ্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ও সর্বদা ন্যায়ানুগ। তাঁরা কোন ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ না করে বা বৈধ সাক্ষ্যের সন্ধান না করে তার বিরুদ্ধে নিছায়েৎ সন্দেহবশতঃ কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন না। এক্ষেত্রে মুমিনদের যত্ন ও সতর্কতা আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠতা ও তাকওয়ারই বহিঃপ্রকাশ। পার্থিব জীবনের সকল কাজের জন্যেই আখিরাতে জবাবদিহি করতে হবে এ-বিষয়ে অবহিত বলে এবং আল্লাহর শাস্তিকে ভয় করে মুমিনগণ এ প্রশ্নে কুরআনের নির্দেশ সম্যক অনুধাবন করে তন্নিষ্ঠ হন। সন্দেহ সম্পর্কে আল্লাহ কুরআনে বলেছেন ঃ

> হে মুমিনগণ! তোমরা অধিকাংশ সন্দেহ পরিহার কর। বস্তুতঃ কোন কোন সন্দেহ অপরাধজনক .....
>
> — কুরআন, ৪৯ ঃ ১২

একজন মুসলিমের কীভাবে তাঁর সময় অতিবাহিত করা উচিত ?

কুরআনে আমরা দেখতে পাই, মুমিনদের জীবনে "অবসর সময়" বা "অবকাশকাল" বলে কিছু নেই ; একজন মুসলমানের জীবনের প্রতিটি মুহূর্তই কর্মব্যস্ত। কারণ, তিনি আল্লাহকে ভয় করেন ও অনুপুঙ্খরূপে তাঁর আদেশসমূহ পালন করেন বিধায় প্রতিনিয়ত আরো অধিক কল্যাণ ব্রতে আত্মনিয়োগ করেন। যে মুমিন ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করেন ও তাঁর আহকাম অনুপুঙ্খরূপে পালন করেন তিনি অব্যাহতভাবে নেক আমলে নিয়োজিত হন এ উদ্দেশ্যে যে, তিনি যেন আরো অধিক নেক আমল করে আল্লাহর সবচাইতে নিকটবর্তীদের অন্যতম হতে পারেন। আল্লাহ কুরআনে যে সকল ইবাদাতের নির্দেশ দিয়েছেন তিনি পরম নিষ্ঠার সঙ্গে সে-সকল ইবাদতের অনুষ্ঠান করেন। একটি কাজ শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি আরেকটি কাজ করতে শুরু করেন। নিরবচ্ছিন্নভাবে সত্য, সুন্দর ও কল্যাণের আরাধনা করেন তিনি। তাঁর এই সকল প্রয়াসে কোন বিরাম বা যতির অবকাশ নেই এবং কর্মপরিধি ও সময়ের কোন সীমা-পরিসীমা নেই। মুমিনদের কাছে একটি কাজের সমাপ্তি আরেকটি কাজ শুরুর ইঙ্গিতমাত্র। কারণ একজন মুমিন সর্বদা এ বিষয়ে সচেতন যে তাঁকে এ দুনিয়ায় অনুক্ষণ আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধানে আত্মনিবেদন করতে হবে এবং আখিরাতে প্রতিটি মুহূর্তের জন্য জবাবদিহি করতে হবে।

মুমিনদের এ সকল প্রয়াসের বিষয়ে কুরআন বলছেন ঃ

> অতএব যখনই আপনার হাতের কাজটি শেষ হবে তখনই পরের কাজটি শুরু করুন ; আপনার রবকেই করুন আপনার চূড়ান্ত লক্ষ্য।
>
> — কুরআন, ৯৪ ঃ ৭-৮

যেহেতু একজন মুমিন যা কিছু করেন তা করেন আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য, সুতরাং তিনি দৈনন্দিন জীবনে যা' কিছু করেন তাই হয় একটি ইবাদাতের কাজ। যখন তিনি ক্লান্ত হন তখন তিনি আল্লাহর খাতিরে বিশ্রাম নেন, যখন তিনি ক্ষুধার্ত হন তখন তিনি ক্ষুন্নিবৃত্তি করেন আল্লাহর খাতিরে। আল্লাহর খাতিরেই তিনি নিদ্রামগ্ন হন কিংবা গাত্র প্রক্ষালন করেন।

ভাববার বিষয়টি হচ্ছে এই যে, এসব কিছুর মধ্যেই আল্লাহকে স্মরণ করতে, তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাতে এবং সবকিছুর মধ্যেই শুভ সন্দর্শন করতে অন্যথা করবেন না।

বাজে ও বাতুল বিষয় বর্জন করা যায় কিভাবে ?
"বাজে ও বাতুল" বিষয় কী ?

যদি কেউ একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য কাজ করে, তাহলে সে সহজেই "বাজে ও বাতুল বিষয়াবলী" বর্জন করতে পারে, কেননা, এরূপ ঈমানদার ব্যক্তি জানে যে, এ দুনিয়ায় তাকে যে আয়ষ্কাল মঞ্জুর করা হয়েছে তার প্রতিটি মুহূর্ত তাকে সর্বাধিক ফলপ্রসূভাবে ব্যবহার করতে হবে। কারণ ইহজীবনে তার আমলই নির্ধারণ করবে আখিরাতে তার অনন্ত নিবাস। কাজেই যে-কাজই সে করুক না কেন, তার ধ্রুব লক্ষ্য থাকে সে-কাজটা যেন এমন হয় যা তার জন্যে পারলৌকিক কল্যাণ বয়ে আনবে। স্বভাবতঃই সে খায়-দায় হাসে-খেলে, ঠাট্টা-তামাশা করে আর নিত্যকর্ম করে যায় অন্য সবার মতই কিন্তু এসব কিছুর মধ্যেও তার মনের গহনে সে বহন করে উচ্চতর ভাবনারাশি যার লক্ষ্য অপরের এবং ধর্মের হিত সাধন। এসব কিছুর উর্ধ্বে মুমিনদের সকল কাজ একটি ঐকান্তিক লক্ষ্যাভিসারী। সে লক্ষ্য হচ্ছে তাদের প্রতিটি কাজে আল্লাহর সর্বাধিক সন্তুষ্টি লাভ।

পার্থিব সকল বিষয়ের পারস্পরিক সম্পর্ক ও স্বাতন্ত্র নির্ণয় করে তাদের যথাযথ মূল্যায়ন করে তারা তাদের সময় সম্পদের সর্বাধিক কার্যকর ও ফলপ্রসূ ব্যবহার করে। বিবেক ও প্রজ্ঞার প্রয়োগে কোনটি বাতুল আর কোনটি প্রয়োজনীয় সেটা নির্ধারণ করে তারা দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে কাজ করে। বাতুল বিষয়ে মুমিনদের মনোভংগী তুলে ধরা হয়েছে কুরআনে এভাবে ঃ

> তারা যখন বাজে কথাবার্তা শুনতে পায় তখন তা এড়িয়ে চলে। তারা বলে, আমাদের জন্যে আমাদের কাজের ফল আর তোমাদের জন্য তোমাদের। তোমাদের সালাম। মূর্খদের সাহচর্য চাইনা আমরা।
>
> — কুরআন, ২৮ ঃ ৫৫

কুরআনে বর্ণিত এই উচ্চতর নৈতিকতার আদর্শ সকলের জন্যই হতে পারে স্বস্তি ও শান্তির এক প্রধান উৎস। এটি আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধায়ক একটি সদাচরণও বটে।

ঈমানদারগণ কিসে ধৈর্য প্রদর্শন করেন ?

মুমিনদের স্বাতন্ত্রসূচক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে তাঁদের একনিষ্ঠতা। তবে কুরআন থেকে আমরা জানতে পারছি যে, একনিষ্ঠতা মানে দুঃসময়ে কষ্ট-সহিষ্ণুতা নয়। কুরআনে যা বলা হয়েছে তার নির্গলিতার্থ হচ্ছে এই যে, ধৈর্যের প্রশ্ন ওঠে তখনই যখন সর্বাবস্থায়, তথা সর্বসময়ে, আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধায়ক আচরণ বেছে নেয়ার সম্মুখীন হয় মানুষ।

আখিরাতে যার ঈমান আছে এমন ব্যক্তিমাত্রই জানেন আল্লাহ মানুষকে বিপদাপদ, রোগশোক ইত্যাদি দুর্দশা দিয়ে পরীক্ষা করেন এ পৃথিবীতে। এ

কারণে তিনি সর্বদা ধৈর্যশীল থাকেন এবং নিকৃষ্টতম বিপদ বা ব্যাধির মুখেও নিজেকে সঁপে দেন আল্লাহর হাতে। সর্বাবস্থায়ই তিনি আল্লাহর মুখাপেক্ষী হন, কারণ তিনি জানেন রোগশোক বিপদাপদসহ সব দুর্দশা আল্লাহই দেন মানুষকে পরীক্ষা করার জন্যে, এবং একমাত্র তিনিই এগুলো ফিরিয়ে নিতে পারেন।

আল্লাহ মুমিনদের পরীক্ষা করেন বহু বিচিত্র পরিস্থিতিতে, যথা ক্ষুধা, ভীতি, সম্পদহানি। কুরআনে বর্ণিত মুমিন ব্যক্তি সকল পরিস্থিতিতেই অটল অধ্যবসায়ের সঙ্গে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের চেষ্টা করেন। সম্পদে তিনি আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন, বিপদে তিনি ভরসা রাখেন আল্লাহর ওপর ; তাঁর কাছে সব সময়ই দ্বীন ও মুমিনদের কল্যাণ তাঁর একান্ত ব্যক্তিগত স্বার্থের উর্ধ্বে। তাঁর চরিত্রে দ্বীনি আকিদার সকল বৈশিষ্ট্য প্রস্ফুটিত থাকে সারা জীবন। তিনি আন্তরিক, সৎ, উদার, বদান্য, পরিশ্রমী ও কৌতূহলী ; তিনি সর্বদা ঔদার্য, মহানুভবতা ও শালীনতার সঙ্গে বাক্যালাপ করেন এবং দ্বীনের সেবায় সতত নিবেদিতপ্রাণ তিনি। মোট কথা, আল্লাহ শুভ বলে যা কিছু নির্দেশ করেছেন তার সব কিছুতেই ব্যাপৃত হন তিনি। তার পুরস্কারস্বরূপ আল্লাহ তাঁর একনিষ্ঠ বান্দাদের সুসংবাদ দিয়েছেন কুরআনের দ্বিতীয় সূরার কতিপয় আয়াতে ঃ

> আমি অবশ্যই তোমাদের পরীক্ষা করবো কিয়ৎ পরিমাণ ভয়, ক্ষুধা এবং ধনসম্পদ, জীবন ও ফল-ফসলের ক্ষতির মাধ্যমে, তবে সুসংবাদ দাও ধৈর্যশীলদের যারা বিপন্ন মুহূর্তে বলে ঃ
>
> "আমরা তো আল্লাহর জন্যে এবং তাঁর কাছেই ফিরে যাব সবাই।" এরাই অশেষ নিয়ামত ও রহমত প্রাপ্ত হবে

তাদের প্রভুর কাছ থেকে আর এরাই হচ্ছে প্রকৃত হেদায়েতপ্রাপ্ত।

— সূরা আল-বাকারা, ১৫৫-১৫৭

আপনি যদি এ-দুনিয়ায় এবং আখিরাতে মনোমুগ্ধকর পুরস্কারে নন্দিত হতে চান তাহলে সকল বিপদ-আপদ ও আধিব্যাধিতে ধৈর্যশীল হোন এবং চারু নৈতিকতায় আপনার আচরণকে অভিষিক্ত করুন।

সমাপ্ত